প্রকাশক—
শ্রীসুধাংশুকুমার দাস
২১৭, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ—২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩১
দ্বিতীয় সংস্করণ—১৫ই মার্চ্চ, ১৯৪৯
তৃতীয় সংস্করণ—২০শে ডিসেম্বর, ১৯৬০

মুদ্রাকর—
বাণী লেখা প্রেস,
১৯, কৈলাস কবিরাজ লেন,
কলিকাতা-৬

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

যাদবপুর টি. বি হাঁসপাতালে রোগশয্যায় শুয়ে "বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথের" তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা লিখতে হবে—এমনটি কখনও ভাবিনি। ব্রিটিশ শাসনের আমলে বইখানি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। কি কারণে, তার কোন যুক্তি খুঁজে পাইনি। বইখানি পড়ে কবি জীবদ্দশায় খুসী হয়েছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা এবং কর্ম্মধারা আমি ঠিকমতই প্রকাশ করেছি—একখানি চিঠিতে তিনি এই কথাই লিখেছিলেন। এ যুগে যাঁরা সাহিত্যকে আশ্রয় করে অসংখ্য নর-নারীর মনে বিপ্লবের আলোড়ন এনেছেন যথা—ইব্‌সেন, বার্ণার্ড শ, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, হুইট্‌ম্যান—রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই সগোত্র, এতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর লেখা বাংলাদেশের চিত্তকে নবতর বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। তরোয়াল, বারুদ ও বোমার সংগে বিদ্রোহকে আমরা আশৈশব এক করে দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু আসল বিপ্লবী ত' তিনি যিনি আমাদের চিন্তার ধারাকে পুরাতন খাত থেকে নূতন খাতে বইয়ে দেন, যাঁর লেখা পড়ে আমরা সম্পূর্ণ নূতনতর দৃষ্টিকোণ থেকে আদর্শের মূল্য বিচার করতে শিখি, যাঁর ভাবধারার সংগে পরিচিত হয়ে মৃত অতীতের দুর্ব্বার মোহ থেকে আমরা মুক্তি পাই, নূতনকে অভ্যর্থনা করতে আমাদের মন প্রস্তুত হয়। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীতে বিদ্রোহের এই অগ্নিশিখা জাজ্বল্যমান। পরমস্নেহাস্পদ কৃষ্ণ (কানু) মহাপাত্রের উদ্যোগে "বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ" পুনরায় প্রকাশিত হোল। এর জন্য তাকে আমার অন্তরের ধন্যবাদ। প্রকাশক শ্রীসুধাংশু দাসকেও এই সংগে আমার ধন্যবাদ জানাই।

কুমুদশংকর রায় হাঁসপাতাল
যাদবপুর
১১।১২।৬০

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বর্তমানে সংস্করণে "দুটি কথা" শীর্ষক গ্রন্থকারের ভূমিকা ও "বিপ্লবী রবীন্দ্রনাথ" নিবন্ধটি যুক্ত হইল ; এই লেখাটি "প্রবাসী"তে (১৩৪৮, শ্রাবণ) প্রকাশিত হয়। বাকি বইটি ব্রিটিশ আমলের সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত বইয়ের হুবহু পুনর্মুদ্রন।

দুটী কথা

রাজরোষের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হ'য়ে 'বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ' পুনরায় জনসমাজে দেখা দিলো। কবি আজ পরলোকে। তিনি বেঁচে থাকতে বইখানি প'ড়ে আমাকে লিখেছিলেন, 'তুমি আমার চিন্তাধারা এবং কর্মধারা ঠিকমতোই বিশ্লেষণ ক'রেছো।' কিন্তু কবির শ্রেষ্ঠ পরিচয় তো তাঁর রচনায়। সমালোচক নতুন ক'রে তাঁর কি পরিচয় করিয়ে দেবে? কথা তো ঠিকই ; তবুও কোন কবিকে যখন আমাদের খুব ভালো লাগে, তাঁর লেখা প'ড়ে আমাদের মনের জীবনের দিগন্তে নতুন তোরণদ্বার খুলে যায় তখন আমাদের সেই ভালো লাগার আনন্দকে আর সকলকে না জানিয়ে থাকতে পারিনে। কবির কালিদাস পড়ার আনন্দ তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্যে' অমর হ'য়ে আছে।

বিংশ শতাব্দী হোলো বিশেষ ক'রে ইঞ্জিনিয়ারদের যুগ। তবুও ভাবাবেগ আগেও যেমন সত্য ছিল এখনও তেমনি সত্য আছে। Chestertonএর ভাষায় ব'লতে গেলে "There is nothing so fiercely realistic as sentiment and emotion."

কালিদাসের যুগে মেয়েরা পুরুষদের এবং পুরুষেরা মেয়েদের যেমন ভালবাসতো আজও তেমনি ভালবাসে। রামায়ণের যুগের মায়েরা তাদের শিশুদের ভালবেসে যে আনন্দ পেতো আণবিক যুগের মায়েরাও সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে সেই আনন্দই পায়। অমরত্বের জন্য প্রাচীনযুগে যে ব্যাকুলতা ছিল মানুষের মধ্যে বিংশ শতাব্দীতেও মৃত্যুকে অতিক্রম করবার জন্য তার মনে আজও সেই ব্যাকুলতা রয়েছে।

কিন্তু এই কাঠের আর লোহার, সোনার আর রূপার, তিসির আর পাটের অতিবাস্তব জগতে কবিতার কি কোন মূল্য আছে? আছে নিশ্চয়ই, কারণ মানুষের কাজের পিছনে রয়েছে তার ভাব। কবিতা আর গান আমাদের মনের এমন একটী সূক্ষ্ম তারে ঘা দেয় যেখানে আর কারও হাত পৌঁছায় না। কাব্য আমাদের মনে একটা বিশেষ অনুভূতি জাগায় আর অনুভূতির অথবা ভাবের বশেই তো আমরা কাজ ক'রে থাকি।

রবীন্দ্রনাথকে আজকের দিনে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমাধিভূমির উপরে নূতন ভারতবর্ষ গড়বার দিন এসেছে। কি আদর্শে আমরা আমাদের স্বদেশকে গ'ড়ে তুলবো তা জানার খুবই দরকার আছে—নইলে শিব গড়তে বাঁদর গড়্‌বো আমরা। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত লেখায় বিরাট বিরাট আদর্শগুলির জয়গান। তাই ধ্বংসের শ্মশানে নবসৃষ্টির এই প্রভাতে তাঁকে ভালো ক'রে জান্‌তে হবে। কবিকে, দার্শনিককে, ভাবুককে বাদ দিয়ে আমরা কিছু ক'রতে গেলে আমাদের সেই করা মঙ্গলের পরিবর্ত্তে শুধু অমঙ্গলকেই ডেকে আনবে। ভাঙা যায় উন্মাদনায়—কিন্তু গড়'তে গেলে চাই গভীর চিন্তাশীলতা। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সর্ব্বত্র এই চিন্তাশীলতার ছাপ।

মৃত্যুর মধ্য থেকে আজও ভেসে আসছে তাঁর অপরাজেয় কণ্ঠস্বর। কবি অমর। আসল কবি ক্ষণকালের ন'ন, চিরকালের।

রবীন্দ্রনাথ চিরকালের। যে-দেশ তার কবিদের ভালবাসতে শেখেনি সে দেশ দুর্ভাগা। ভারতবর্ষ তার গান্ধীজীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকেও প্রাণের মধ্যে বরণ ক'রে নিয়েছে—এইখানেই আমাদের আশা।

কলিকাতা
১৫।৩।৪৯

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

কবি সৌন্দর্য্যের পূজারী। যেখানে স্বাধীনতা নাই সেখানে সৌন্দর্য্যও নাই। কবির বীণা হইতে মুক্তির জয়গান তাই উৎসারিত হইয়া থাকে। মানবাত্মার সৌন্দর্য্যের প্রকাশ স্বাধীনতার মধ্যে যেখানে ভিতরের প্রবৃত্তি মানুষকে পঙ্ককুণ্ডে বাঁধিয়া রাখে না, বাহিরের বাধা তাহার মনকে এবং দেহকে শৃঙ্খলিত করে না।

শুনিতে পাওয়া যায়, ট্রয় নগরীর প্রাকার রচনা করিয়াছিল এ্যাপোলোর বাঁশীর সুর। কবির হাতে এ্যাপোলোর সেই বাঁশী। সেই বাঁশীর সুর রচনা করে নূতনতর জগৎ যেখানে প্রেমের মধ্যে পরাধীনতা নাই, যেখানে অবিচার নাই, কুসংস্কারের আবর্জ্জনা নাই—যেখানে মানুষ ভিতরের এবং বাহিরের সকল বন্ধন হইতে মুক্ত। সেই নূতন জগতে ভালবাসার মাঝে আছে মুক্তি, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মাঝে আছে হৃদয়ের কোমল স্পর্শ। সেখানে জীবনের উচ্ছল প্রকাশ শত কার্য্যে, শত চিন্তায়, বীর্য্যের মাঝে, ত্যাগের মাঝে, আনন্দের মাঝে।

রবীন্দ্রনাথ সেই সুন্দর জগত রচনা করিতে চাহিয়াছেন তাঁহার বেণুর পাগল-করা সুরে। কবির বাঁশীর সুরে তাই মুক্তির ঝঙ্কার। যাহা কিছু আত্মাকে বাঁধিয়া রাখে কদর্য্যতার পঙ্কে তাহাকে তিনি ধ্বংস করিতে চাহিয়াছেন তাঁহার সুরের বজ্রাগ্নি-শিখায়।

চাঁদের সঙ্গে, মাধবীর সঙ্গে, কেয়াবনে মৌমাছির সঙ্গে কবির যেখানে গোপন পরিচয়, মেঠোফুলের পাশাপাশি শুইয়া যেখানে তাহার বাঁশী শুনিতে শুনিতে তিনি বিভোর, সেইদিকটার চিত্র আমি আঁকি নাই। আমার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি তাহার ভার লইবেন। কবি যেখানে বজ্রের মধ্যে বাঁশী শুনিয়াছেন, ক্ষতির ক্ষুরে সকল বাঁধন কাটিতে চাহিয়াছেন, তুফানের ডাকে কূল হইতে 'অকূল নীরে' ছুটিয়াছেন সেইদিকটার ছবিই আমি আঁকিয়াছি।

জগতের যে কোন একজন শ্রেষ্ঠ কবিকে ভাল করিয়া জানিলে অন্যান্য কবিকে জানার পথ প্রশস্ত হয়। রবীন্দ্রনাথকে ভাল করিয়া জানিলে আমরা বাংলাদেশকে জানিব, ভারতবর্ষকে জানিব, নূতন জগতের নাড়ীর স্পন্দনকে বুকের মধ্যে অনুভব করিব, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাবুকগণের চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইব। রবীন্দ্রনাথের বহুপূর্ব্বের লেখা হইতে আরম্ভ করিয়া অতি আধুনিক লেখা 'রাশিয়ার চিঠি' পর্য্যন্ত নানা পুস্তক হইতে এমন সব অংশ এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে যেগুলি কবির বিপ্লবাত্মক চিন্তা প্রতিফলিত করিয়াছে। 'বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ' কানে একটু নূতন শোনায় বটে কিন্তু সে কেবল বিদ্রোহী কথাটীর অর্থ সঙ্কীর্ণভাবে লইয়াছি বলিয়া। বিদ্রোহী সে-ই মিথ্যা জীর্ণ সংস্কারকে যে আঘাত করে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের চিত্তে নব নব চিন্তাধারা আনিয়া দিয়াছেন। সেই সকল চিন্তা সতেজ, সবল, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ভয়ঙ্কর। তাহারা জাতির-চিত্তকে মিথ্যার গণ্ডী হইতে সত্যের মধ্যে মুক্তি দিয়াছে। যেখানে আমরা পানের বাটা, ফুলের মালা, বেহালা এবং তবলা বাঁয়া লইয়া-ছিলাম, বড় জোর কাগজ নাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে পোলিটিক্যাল তর্ক করিতাম, সেখানে তিনি মরুভূমির ঝড় আনিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথকে এই দিক দিয়া আমি বিদ্রোহী বলিয়াছি।

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহী কবি। বাঁশীর স্বরে সাপের জড়তা ঘোচে, রবীন্দ্রনাথের গানে জাগিয়া উঠিয়াছে আমাদের তরবারি যাহা সকল বাঁধন ক্ষয় করিয়া আমাদের অন্তর্নিহিত ভূমাকে প্রকাশ করে। কিন্তু কবিকে শুধু বিদ্রোহী বলিলেই তাঁহার সম্বন্ধে সকল কথা বলা ফুরাইয়া যায় না। বিদ্রোহী ভাঙিতে চায়। কবি রবীন্দ্রনাথও ভাঙিতে চাহিয়াছেন—যাহা মিথ্যা, যাহা জীর্ণ, যাহা অ-সুন্দর তাহাকে সবলে ভাঙিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু এই ভাঙার দিক হইতেছে সত্যের একটা দিক মাত্র। আর একটা দিক আছে সত্য যেখানে আপনাকে অহরহ প্রকাশ করিতেছে সুন্দরকে সৃষ্টি করিয়া। ধ্বংস যতখানি সত্য, সৃষ্টিও ততখানি সত্য, জীবনের মধ্যে যাঁহার প্রকাশ মৃত্যুর মধ্যেও তাঁহারই প্রকাশ; যিনি ভাঙিতেছেন, তিনিই আবার আর এক দিকে গড়িতেছেন। বাসুদেবঃ সর্ব্বম্—To know Vasudeva as all and live in that knowledge is the secret.

এই পরম সত্য ধরা দেয় কবির কাছে—কারণ জগত ও জীবনকে কবি কেবল বাহির হইতে দেখে না—তাহার দৃষ্টি যায় সকলের অন্তরে। কবি কেবল কাছের জিনিষ দেখে না—তাহার দৃষ্টি দূর হইতে সুদূরে প্রসারিত। সাধারণ মানুষ যাহা দেখে কবি তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী করিয়া দেখে। সেই মানুষই তত বড় যাহার দেখিবার ক্ষমতা যত বেশী। কবি সৃষ্টি করে—কারণ তাহার দৃষ্টি আছে। যেখানে অন্য মানুষ শুনিতে পায় কেবল বিরোধের কোলাহল, সেখানে কবির

কান শোনে মিলনের বাণী ; যাহা অন্যের কাছে কেবল ভীষণরূপে দেখা দেয়, কবি তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পায় মনোহরকে ; যাহা অপরের নিকট উপস্থিত হয় অশান্তিরূপে—কবির চিত্তে তাহা শান্তির অমৃত বহন করিয়া আনে। বন্ধনের মাঝে সে লাভ করে মুক্তির আস্বাদন, বজ্রের মধ্যে সে শুনিতে পায় বাঁশীর পাগল-করা সুর ; অন্ধকারের উৎস হইতে সে আলোককে উৎসারিত হইতে দেখে ; মৃত্যুর বুক ভেদ করিয়া, সে দেখে অমৃত ঝরিয়া পড়িতেছে। আপাত-দৃষ্টিতে যাহাদিগকে পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হয়—কবি তাহাদের মধ্যে খুঁজিয়া পায় মিলনের সুর। অন্যের কাছে যাহা খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন এবং বিকৃত হইয়া দেখা দেয় কবির চিত্তাকাশে তাহা সম্পূর্ণ রূপ লইয়া উদিত হয়। ইহার কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি, আবার বলি : অন্যে যাহা দেখে, কবি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী করিয়া দেখে। কবি দেখে দেহ, মন, প্রাণ সমস্ত দিয়া। এই দেখিবার ক্ষমতা বেশী বলিয়া কবির সমন্বয় সাধনের ক্ষমতাও বেশী, আর তাহার প্রতিভার মূলে এই সমন্বয় সাধনের শক্তি। কবি কাহাকেও বর্জ্জন করে না—সকলকে সে গ্রহণ করে। ফুল ও কাঁটা, জোয়ার ও ভাটা, জীবন ও মৃত্যু, আলো ও ছায়া—কবির কাছে সব সত্য ; কারণ সে জানে—বাসুদেবঃ সর্ব্বম্ ; সকলকে মিলাইয়া যিনি জাগিতেছেন তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। কবি সব দলের শতদল পদ্ম।

রবীন্দ্রনাথ কবি—অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কবি। যে দৃষ্টি থাকিলে কবি হওয়া যায়—রবীন্দ্রনাথে তাহা পূর্ণভাবে বর্ত্তমান। তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে সত্য আপনাকে সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ করিয়াছে। এই প্রকাশের মহিমা এমনই বিপুল, এমনই সুন্দর যে কবি তাহাকে ছন্দে ও সুরে রূপ না দিয়া পারিলেন না। যিনি সত্য, যিনি শিব তিনি সুন্দরের বেশে শিল্পীর কাছে আপনাকে প্রকাশ করেন। সুন্দরের রূপ ধ্যান করিতে করিতে শিল্পী আনন্দে আত্মহারা হইয়া যায়। সেই উচ্ছ্বসিত আনন্দ তখন প্রকাশ পায় শিল্পীর কবিতায়, গানে, চিত্রে। সত্যকে যখন

আমরা সকল দিক দিয়া জানি, যিনি অসীম সীমার মধ্যে তাঁহার প্রকাশকে যখন সর্ব্বত্র আমরা উপলব্ধি করি, তখন সুখ দুঃখ, আলো ছায়া, জীবন মৃত্যু সব কিছুই আমাদের প্রাণে আনন্দের তরঙ্গ তুলে—সব কিছুই আমাদের কাছে মধুর হইয়া দেখা দেয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্য আপনাকে অখণ্ডরূপে প্রকাশ করিয়াছে। এই জন্যই কবির সৃষ্টির মধ্যে কোথাও বে-সুরো বলিয়া কিছু নাই। রূপের মধ্যে তিনি অরূপের লীলা দেখিয়াছেন—সীমার মাঝে অসীমের তিনি সুর শুনিয়াছেন। জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে তাঁহার মন বন্ধন-মুক্ত হইয়াছে। এই আনন্দের প্রকাশ তাঁহার কবিতায়।

আমি যে রূপের পদ্মে ক'রেছি অরূপ মধু পান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,
অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে,
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে।*

সত্যকে সকল দিক দিয়া জানিয়া যে মন বন্ধন-মুক্ত হইয়াছে সেই মনের কাছে আনন্দ কেবল মৃত্যু ও বেদনার বেশে দেখা দিবে না। জীবন-বীণা যেখানে কোমল-সুরে বাজে, জগত যেখানে হাসির মধ্যে মধুর হইয়া দেখা দেয়—সেখানেও সেই মন আনন্দরসের আস্বাদন পাইবে। রবীন্দ্রনাথ যদি কেবল 'বিদ্রোহী' কবি হইতেন তবে তাঁহার মধ্যে শুধু ভাঙার দিকটাই আমরা দেখিতে পাইতাম—তাঁহার ছন্দের মধ্যে শুধু মরণের সুর শুনিতাম। কিন্তু তিনি বিদ্রোহী ছাড়া আরও কিছু। জীবনকে তিনি বিভিন্ন দিক হইতে বিচিত্রভাবে দেখিয়াছেন—দেখিয়া কখনও হাসিয়াছেন, কখনও কাঁদিয়াছেন, কখনও আনন্দের আতিশয্যে জয়ধ্বনি করিয়াছেন। "The greatest literary artists must be best balanced, so all these three cries—the moan, the laugh and the cheer must

* পূরবী

sound in their work. Life is equally a matter for tears and laughter and applause." তাঁহার কাব্যের মধ্যে ভীষণ ও মধুরের একত্র সমাবেশ হইয়াছে—হাসি ও অশ্রুজল মিশিয়া গিয়াছে—তাই তিনি এত বড় কবি। তাঁহার কবি-চিত্ত দখিন-বাতাসে মাধবী ফুলের সঙ্গে নাচিয়াছে—উন্মাদ-ফেনিল সিন্ধুর তরঙ্গের সাথে দুলিয়াছে; বেণুবনবীথিকার মর্ম্মর ধ্বনি শুনিয়া তিনি যতখানি আনন্দ পাইয়াছেন—বৈশাখী সন্ধ্যার ঝঞ্ঝার দামামা তাঁহাকে ততখানিই আনন্দ দিয়াছে; জীবন ও মরণ উভয়কেই তিনি সমভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছেন; ফোটা ফুলের মেলা এবং শুক্‌নো পাতার খেলা—কাহাকেও তিনি ছোট করিয়া দেখেন নাই; অট্টহাসি হাসিয়া ঝড়ের বেশে যে আনন্দ আসে—সেই আনন্দকে তিনি যেমন নিবিড়ভাবে অনুভব করিয়াছেন—শারদ প্রভাতে শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে যে আনন্দ হাসে সেই আনন্দের পরশও তিনি তেমনি নিবিড় ভাবেই পাইয়াছেন। তাই এই পুস্তকের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে—কবিকে শুধু বিদ্রোহী বলিলেই তাঁহার সম্বন্ধে সকল কথা বলা ফুরাইয়া যায় না।

২

কবির মধ্যে কোমল ও কঠিন দুইটী দিকই বর্ত্তমান থাকিলেও আমরা তাঁহার কঠিন দিকটাই বাছিয়া লইয়াছি এবং তাঁহাকে বিদ্রোহীরূপে চিত্রিত করিয়াছি। তাঁহার কোমল দিকেরও পরিচয় দিতে পারিতাম—কিন্তু এখন সে সময় নয়। ললাট হইতে যেদিন দাসত্বের ছাপ মুছিয়া যাইবে, অঙ্গ হইতে যেদিন শৃঙ্খল খসিয়া পড়িবে সেই দিন কবির কোমলরূপের পূজা করিব। আজ ভাল লাগে তাঁহাকে বিদ্রোহীর বেশে দেখিতে, তাঁহার কণ্ঠে ঝড়ের গান শুনিতে। যে জাতির সর্ব্বাঙ্গে শৃঙ্খলের ছাপ তাহার নিকট ভাঙার গান ছাড়া আর কোন্ গান প্রিয় হইতে পারে? আমরা পরাধীন জাতি। পরাধীন জাতির সকলের চেয়ে প্রিয় স্বপ্ন হইতেছে বাঁধন-ছেঁড়ার স্বপ্ন—তাহার কাছে সকলের চেয়ে মনোহর ছবি হইতেছে স্বাধীনতার ছবি। মন্ত্রতন্ত্র যোগাযোগ, দর্শনবিজ্ঞান—পরাধীন জাতির কাছে এ সবের কোন মূল্য নাই। 'It will attend to no business, however vital except the business of unification and liberation.'* স্বাধীনতা তাহার দিবসের চিন্তা, নিশীথের স্বপ্ন। এই জন্য যে কবির কণ্ঠে আমরা ভাঙার গান শুনিতে পাই—সে আমাদের এত প্রিয় হইয়া উঠে; যে বক্তার কণ্ঠে বাঁধন ছেঁড়ার আহ্বান গর্জ্জিয়া উঠে তাহাকে আমরা এত ভালবাসি; যে কর্ম্মীর হস্তে ধ্বংসের নিশান তুলিতে দেখি

* Bernard Shaw: Introduction—"John Bull's other Island."

তাহাকে এত আপনার বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহীর রূপ যে আমাদের কাছে এত প্রিয় লাগে সেও এই কারণেই।

পরাধীন জাতির বাঁধন-ছেঁড়ার মন্ত্র রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যেমন করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে এমন আর কোন কবির কাব্যে নাই। তিনি চিরদিনই স্বাধীনতার পূজারী। বাল্যকালেই যাঁহার মন নীরস বিদ্যালয়ের কঠিন বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল তিনি কোনদিনই কাহাকেও আপনার সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে পারিলেন না। আপনাকে যিনি সম্মান করেন অপরের অসম্মানে ব্যথিত হওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। তাই যেখানে মানুষ লোকভয়ে, রাজভয়ে, মৃত্যুভয়ে-অভিভূত হইয়া মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা পরিহার করিয়াছে, অপরের পদপ্রান্ততলে আপনার শির লুণ্ঠিত হইতে দিয়াছে, সেখানে সেই ভীরুতার লজ্জাকে কবি নিজের লজ্জা বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। আমরা যে পলে পলে অপমান এবং অবিচার সহ্য করি তাহার মূলে সাহসের অভাব। তাই ভীরুতার গ্লানি হইতে জাতির চিত্তকে মুক্ত রাখিবার জন্য প্রহরীর মত বিনিদ্র নয়নে জাগিয়া আছেন। সে জাগার আজও বিরাম নাই। ক্ষমা যেখানে ক্ষীণ দুর্ব্বলতা সেখানে কবি নিষ্ঠুর হইয়াছেন—অন্যায়কে সকল শক্তি দিয়া আঘাত করিয়াছেন—কাহারও ভয়ে ভীত হইয়া মিথ্যাকে সিংহাসন ছাড়িয়া দেন নাই।

আমারে সৃজন করি' যে মহা-সম্মান
দিয়েছ আপন হস্তে, রহিতে পরাণ
তা'র অপমান যেন সহ্য নাহি করি!
যে আলোক জ্বালায়েছ দিবস-শর্ব্বরী
তা'র ঊর্দ্ধশিখা যেন সর্ব্ব উচ্চে রাখি,
অনাদর হ'তে তা'রে প্রাণ দিয়ে ঢাকি!
মোর মনুষ্যত্ব সে যে তোমারি প্রতিমা,
আত্মার মহত্ত্বে মম তোমারি মহিমা
মহেশ্বর! সেথায় যে পদক্ষেপ করে,
অপমান বহি' আনে অবজ্ঞার ভরে

হোক না সে মহারাজ বিশ্বমহীতলে
তা'রে যেন দণ্ড দিই দেব-দ্রোহী বলে'
সর্ব্ব-শক্তি ল'য়ে মোর! যাক্ আর সব,
আপন গৌরবে রাখি তোমার গৌরব।*

জীবনের সর্ব্বপ্রিয় বস্তু চলিয়া যাক্ সে ক্ষতি সহনীয়; কিন্তু অপরের ভয়ে সরিসৃপের মত বুকে হাঁটিয়া ধুলিতলে কোনমতে বাঁচিয়া থাকায় যে ক্ষতি—সে ক্ষতির সীমা নাই, সে ক্ষতি ভয়ঙ্কর। 'না খেয়ে মরার দুঃখ কম নয় কিন্তু এমন অবস্থা আছে যখন বেঁচে থাকার মত দুঃখ আর নেই।'† যে আমার দেহকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দেয়, সে আমার ক্ষতি করে সত্য; তবে সে ক্ষতি বাহিরের ক্ষতি। কিন্তু যে আমাকে ক্রীতদাস করিয়া রাখে, প্রতিদিন লাঞ্ছিত এবং অপমানিত করে, সে আমাকে দেহের দিক দিয়া মারিল না সত্য কিন্তু অন্তরের দিক দিয়া সে আমাকে একেবারে মারিয়া ফেলিল। তাহাকে ক্ষমা করিতে নাই। কারণ সে মনুষ্যত্ব, বীর্য্য, আত্মসম্মান এবং পৌরুষকে কাড়িয়া লইয়া মানুষকে অমানুষ করিয়া ফেলে। 'It is not killing and dying that degrades us but base living, and accepting the wages and profits of degradation.'‡

বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের দিনে কবি যে, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়া সেই আন্দোলনকে বরণ করিয়াছিলেন তাহার মূলে ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কার্জ্জনের দাম্ভিকতাকে তিনি ক্ষমা করিতে পারেন নাই—কারণ সেই ক্ষমার মধ্যে তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন দুর্ব্বলতা, ভীরুতা ও মিথ্যা। রাজভক্তি তাঁহার কাছে ক্রীতদাসের হীনতার বেশে দেখা দিয়াছিল। যে জাতি ভগবানকে সর্ব্বাশ্রয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল, মৃত্যুর মাঝে অন্তহীন প্রাণকে দেখিয়াছিল, সেই জাতি

* স্বদেশ ও সংকল্প।

† তপতী। ‡ Bernard Shaw: "Man and Superman."

ভয়ে এবং মরণের ভয়ে প্রাণকে আঁকড়িয়া রহিবে, মনুষ্য-মর্য্যাদাগর্ব্ব পরিহার করিবে, মিথ্যা ও অপমানকে জীবনে প্রতিদিন স্বীকার করিয়া লইবে—এই চিন্তা কবিকে অত্যন্ত ব্যথিত করিয়াছিল।

তাই বাংলার সেই অগ্নি-পরীক্ষার দিনে বিপুল যাত্রা-সঙ্গীতে চারিদিক মুখরিত করিয়া কবি গাহিয়াছিলেন,—

আগে চল্, আগে চল্ ভাই!
পড়ে' থাকা পিছে মরে' থাকা মিছে,
বেঁচে মরে' কিবা ফল ভাই।
আগে চল্, আগে চল্ ভাই।*

দেশকে মা বলিয়া ডাকিয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য সেদিন তিনি সবাইকে ডাক দিয়াছিলেন,—

দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক্ বিজুলি,
প্রভাত-গগনে কোটি শির তুলি'
নির্ভয়ে আজি গাহরে।†

জালিয়ানওয়ালাবাগে নরমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানের পর ক্ষুব্ধ কবি উপাধিবর্জ্জন করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় বড়লাটকে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহার মধ্যেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু স্বার্থোদ্ধত অবিচার যেখানে লোভে অন্ধ হইয়া লক্ষমুখ দিয়া অক্ষমের বক্ষরক্ত শোষণ করিতেছে সেখানে সেই অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে গেলে বিপদ ও আঘাত অনিবার্য্য। সেখানে অর্থপিশাচ শক্তিমানের হাতে রহিয়াছে কারাগারের চাবি, ফাঁসির রসি, রাইফেল এবং কৃপাণ; সেখানে—

পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্ত সর্প গূঢ়ফণা।‡

তবুও আঘাত যত গুরুতর, বেদনা যত নিবিড়, অত্যাচার যত ভীষণ এবং দুঃখ যত দুঃসহ হোক না কেন, অবিচার এবং অনাচারের বিরুদ্ধে

* স্বদেশ। † জাতীয় সঙ্গীত। ‡ বলাকা।

লড়িতেই হইবে। মিথ্যার সঙ্গে গোঁজামিল দিয়া, ভীরুতার সঙ্গে আপোষ করিয়া জীবন যাপন করা যে মনুষ্যত্বের অপমান! অন্যায় যে করে সে-ই শুধু অপরাধী নহে; অন্যায় যে সহে অপরাধ তাহারও। বিধাতার নিকট হইতে যে অধিকার লাভ করিয়াছি—মানুষের ভয়ে যদি সেই অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতে দিই তবে জীবনের সার্থকতা রহিল কোথায়?

তুমি যা দিয়েছ মোরে অধিকার ভার
তাহা কেড়ে নিতে দিলে অমান্য তোমার।*

তাই অত্যাচারের সঙ্গে, ঔদ্ধত্যের সঙ্গে, নিমেষের জন্যও আপোষের কথা উঠিতেই পারে না। ইহা মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধ, ভগবানের বিরুদ্ধে অপরাধ। অবিচারের বিরুদ্ধে এই অভিযানে কেহ যদি সহায় না হয় তবে একলাই পথ চলিতে হইবে।

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল্‌রে।
তবে একলা চল্‌, একলা চল্‌,
একলা চল্‌রে।†

পথে আঁধার নামিয়া আসিবে, কিন্তু থামিলে চলিবে না। অন্ধকারে বারে বারে আমরা দীপ জ্বালিব; বারে বারে সে দীপ হয়ত নিভিয়া যাইবে তবু ভাবনা করিলে চলিবে না। আমাদের বাণী শুনিয়া বনের প্রাণী পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিবে কিন্তু সে ডাকে আমাদের আপন ঘরে পাষাণ-হিয়া হয়ত গলিবে না; তবু ভাবনা করিলে চলিবে না। আমাদিগকে দেখিয়া লোকে দুয়ার রুদ্ধ করিবে; সেই রুদ্ধ দুয়ার আমরা বারে বারে ঠেলিব—হয়ত দ্বার খুলিবে না; তবু ভাবনা করিলে চলিবে না।

* স্বদেশ।
† জাতীয় সঙ্গীত।

তা বলে ভাবনা করা চ'ল্‌বে না।
তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে
তা ব'লে ভাবনা করা চ'ল্‌বে না
তোর আশা-লতা প'ড়বে ছিঁড়ে
হয়ত রে ফল ফলবে না।
তা ব'লে ভাবনা করা চ'ল্‌বে না।*

যদি ভয়ে ভয়ে কেহ না বলে আমাদিগকে মনের কথা, মুখ ফুটিয়া একলাই বলিতে হইবে; দুর্গম পথে চলিবার কালে কেহ যদি সাথের সাথী না হয় তবে রক্তমাখা চরণতলে পথের কাঁটা আমাদিগকে একলাই দলিতে হইবে; যদি কেহ আলো না ধরে, যদি ঝড়বাদলে আঁধার রাতে সকলেই ঘরে দুয়ার দেয়, তবে বজ্রানলে বুকের পাঁজর জ্বালাইয়া আমাদিগকে একলাই জ্বলিতে হইবে।

যদি কেহ আলো না ধরে—
(ওরে ওরে ও অভাগা)
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে
একলা জ্বল্‌রে।†

অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই যে বিদ্রোহের প্রচণ্ড সুর—রবীন্দ্রনাথের গানে ও কবিতায় ইহার প্রকাশ অপূর্ব্ব। বাঙ্গালার অশান্ত বিদ্রোহী সন্তান যখন ঘরে বাহিরে কেবল বাধার পর বাধা পাইয়াছে তখন তাহার কর্ণে আশার বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। অন্ধকার যখন চারিদিক হইতে তাহাকে ঘেরিয়া ধরিয়াছে তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে সে আলোক পাইয়াছে রবীন্দ্রনাথের গানে, কবিতায়, প্রবন্ধে। পিছনে গুপ্তচর; সম্মুখে অজানা দেশ; সঙ্গে আত্মীয় বন্ধু কেহ নাই; বনের প্রান্তে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে;

* জাতীয় সঙ্গীত।
† জাতীয় সঙ্গীত।

সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে মনে পড়িতেছে মায়ের মুখ, যে মা গৃহ-হারা সন্তানের বিচ্ছেদে অধীর হইয়া পিছনে একাকিনী অশ্রুপাত করিতেছেন। যৌবনের প্রথমে যাহারা বিদ্রোহের পথে সঙ্গী ছিল তাহাদের কেহ ফাঁসির দড়ি চুম্বন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—কেহ পথের দুঃখ সহিতে না পারিয়া গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। শুধু তাহারই ছুটি নাই। সহসা মনের তারে কবির রাগিণী গুঞ্জরিয়া উঠে—"একলা চল্, একলা চল্, একলা চল্‌রে।" সুরের আগুনে পুঞ্জীভূত অবসাদভার ভস্মসাৎ হইয়া যায়; সঙ্গীহীন প্রাণে কবির গান নূতন প্রেরণা দান করে; দুর্ব্বলতা দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া বিদ্রোহী পথে চলা আবার সুরু করিয়া দেয়; সে ঘুমাইয়া পড়িলে এতদিনের সাধনা যে ব্যর্থ হইয়া যায়!

ঐ শোন শোন কল্লোলধ্বনি
ছুটে হৃদয়ের ধারা।
স্থির থাকো তুমি, থাক তুমি জাগি
প্রদীপের মত আলস তেয়াগি,
এ নিশীথ মাঝে তুমি ঘুমাইলে
ফিরিয়া যাইবে তারা।*

অবসাদের অন্ধকার যখন চারিদিক হইতে ঘনাইয়া আসিয়াছে তখন সেই অন্ধকারে কত না অবসন্নচিত্ত কবির গান ও কবিতার মধ্যে নূতন আলোক, নূতন প্রাণ লাভ করিয়াছে!

হবে, হবে, হবে জয় হে দেবী করিনে ভয়
হব আমি জয়ী!
তোমার আহ্বান বাণী সফল করিব রাণী
হে মহিমাময়ী।
কাঁপিবে না ক্লান্ত কর, ভাঙ্গিবে না কণ্ঠস্বর,
টুটিবে না বীণা।

* কথা ও কাহিনী।

নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘ রাত্রি রব জাগি
দীপ নিবিবে না!
কর্ম্মভার নব প্রাতে নব সেবকের হাতে
করি যাব দান,
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে'
তোমার আহ্বান!*

জানিনা সংকল্পের দৃঢ়তা, বিশ্বাসের এই গভীরতা আর কোন কবির কাব্যে এমনভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে কি না! এই সব গান ও কবিতা বিদ্রোহীর অশান্ত জীবনে কতখানি আশা ও সান্ত্বনা যে বহন করিয়া আনে তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার নহে।

যে বিদ্রোহী, তাহার সাধনা—কঠিনের সাধনা। তাহার বাধা কেবল বাহিরের নহে—ভিতরের দিক দিয়াও তাহাকে অনেক বাধা সহ্য করিতে হয় আর ভিতরের বাধা বাহিরের অপেক্ষা অনেক বেশী প্রবল। রেগুলেশন লাঠির মধ্যে বিপদ আছে সত্য, কারাগার খুব সুখের স্থান নহে ইহাও সত্য; তবে এ সকল বাধা অতিক্রম করা তাহার পক্ষে খুব কঠিন নহে। কিন্তু যে পথের বাঁকে বাঁকে অপেক্ষা করিতেছে কাল-বৈশাখীর আশীর্ব্বাদ ও শ্রাবণ-রাত্রির বজ্রনাদ, যে পথে শুধুই অনাহার, দারিদ্র্য, ক্রুদ্ধ শত্রুর ভ্রুকুটী এবং সর্ব্বপ্রকারের ক্ষতি—স্বাধীনতার সেই দুর্গম পথে চলিবার কালে' যখন প্রিয়-জনেরা আসিয়া চরণে 'প্রেম-বাহুঘেরা অশ্রুকোমল শিকলি' বাঁধিয়া দেয় তখন সত্যই 'মিছে মনে হয় জীবনের ব্রত মিছে মনে হয় সকলি!' তখন চিত্ত যাহার অত্যন্ত সবল তাহারও পা যেন চলিতে চাহে না—ইচ্ছার বিরুদ্ধে অশ্রু-সজল নয়ন বার বার পিছন পানে চায়—যেখানে

মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুছিছে।

কিন্তু বাধা কি কেবল বিদায়ের কালে? পথে চলিতে চলিতে মনে

* স্বদেশ ও সংকল্প।

পড়ে বিরহিনী প্রিয়ার ম্লান মুখচ্ছবি। সে হয়ত আকুল কেশভার এলাইয়া একাকিনী তাহার জন্য কাঁদিতেছে; ইচ্ছা করে ছুটিয়া গিয়া একবার শেষ দেখা দেখিয়া আসি। মনে পড়ে আঙিনার সেই মুকুল-আকুল বকুল-কুঞ্জের কথা যেখানে বসিয়া কোকিল বিরহ-রোদনে চারিদিকে কাঁদাইতেছে; মনে পড়ে চির-কলতান উদার গঙ্গার কথা যাহার তীরে তাহার শৈশব ও কৈশোরের কত না স্মৃতি মিশাইয়া আছে। ভাবিতে ভাবিতে তাহার গতি শিথিল হইয়া আসে; ঘুম তাহাকে জড়াইয়া ধরে; মনে হয় অর্দ্ধপথ হইতে ফিরিয়া যাই। কিন্তু ফিরিয়া যাওয়ার মধ্যে দুর্ব্বলতা আছে অথচ সম্মুখের দিকেও চরণ চলিতে চাহে না। তখন নিজের দুর্ব্বলতাকে সমর্থন করিবার জন্য সে কত না যুক্তির আশ্রয় লয়! দেশই কি কেবল সত্য! গৃহ কি মিথ্যা! যাহাকে সত্য মনে করিয়া এত দুঃখ ভোগ করিতেছি তাহা যে পরিণামে মিথ্যা নহে ইহা কে বলিল?

এই সংশয়-মাঝে কোন পথে যাই,
কার তরে মরি খাটিয়া!
আমি কা'র মিছে দুখে মরিতেছি, বুক
ফাটিয়া!
ভবে সত্য মিথ্যা কে করেছে ভাগ
কে রেখেছে মত আঁটিয়া।

তাহার পর যদি ধরিয়া লওয়া গেল—দেশের প্রতি কর্ত্তব্য, সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য, ঘরের কর্ত্তব্যের অপেক্ষা বড়—কিন্তু সে কাজ আমার একাকীর পক্ষে করা কতটুকু সম্ভবপর? কত বুদ্ধ, খৃষ্ট, নিমাই আসিলেন। কিন্তু জগতের কতটুকু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে? লাভের মধ্যে দেখিব, যৌবন চলিয়া গিয়াছে, জীবনের সহস্র কামনা অপূর্ণ রহিয়া যাইবে—অথচ জগতেরও কোন লাভ বা পরিবর্ত্তন হইবে না।

শেষে দেখিব, পড়িল সুখ যৌবন
ফুলের মতন খসিয়া,
হায় বসন্ত বায়ু মিছে চলে গেল
শ্বসিয়া !
সেই যেখানে জগৎ ছিল এককালে
সেইখানে আছে বসিয়া।

—কিন্তু সহসা সংশয় জাল ছিন্ন হইয়া গেল। কবি বলিলেন, এই সব যুক্তি তর্ক আপনাকে ফাঁকি দিবার কৌশল মাত্র ; এই কুহক-রাগিণী পথিকের প্রাণকে কেবল বিবশ করে ; ইহা তাহাকে সত্যে পৌঁছাইয়া দেয় না। যাহা সহজ তাহা ফাঁকি, যাহা কঠিন তাহাই সত্য ; মানুষ দুর্ব্বল, সত্য পথে চলিবার বেদনাকে এড়াইবার জন্য সে সহজেই লোভ দেখাইয়া আপনাকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করে। এই মিথ্যা হইতে মানুষকে মুক্ত রাখিতে পারেন তিনি যিনি মানুষের অপেক্ষা শক্তিমান। কবি তাঁহার শরণ লইতেছেন।

থাম ! শুধু একবার ডাকি তাঁর নাম
নবীন জীবন ভরিয়া !
যাব যাঁর বল পেয়ে সংসার পথ
তরিয়া,
যত মানবের গুরু মহৎ জনের
চরণ-চিহ্ন ধরিয়া।

তাঁহার চরণ শরণ লইলে তিনি যে পথে লইয়া যাইবেন সে পথ কিন্তু আরামের পথ নহে—সে পথ পাষাণ-কঠিন। না, গৃহে ফেরা আর হইল না, প্রিয়ার পরশ আর মিলিল না ! কবি কঠিনের সাধনাকেই অবশেষে সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেন।

সদা সহিয়া চলিব প্রথম দহন
নিঠুর আঘাত চরণে !
যাব আজীবন কাল পাষাণ-কঠিন
সরণে।

যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ
সুখ আছে সেই মরণে।

কবি শেষ পর্য্যন্ত যে পথের নির্দ্দেশ দিলেন তাহা বিদ্রোহীর পথ। সে পথ কঠিন এবং কঠোর। কবি বলিলেন, এই কঠিন পথে যদি মৃত্যু আসে তবুও সেই মরণে সুখ আছে—কারণ সে মরণ গৌরবের। আরামের মধ্যে নিজের ক্ষুদ্র সুখটুকু লইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মহাবিশ্ব-জীবনের তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়া সত্যের জন্য মৃত্যু বরণ করা শ্রেয়ঃ। এই ধরণের কবিতা বাঙ্গলা ভাষায় আর কেহ লিখেন নাই; বিদ্রোহীর মনের নানা ভাবের বৈচিত্র্যকে এমন করিয়া আর কেহ রূপ দান করেন নাই; তাহার সঙ্কল্প ও আদর্শ এমন করিয়া আর কাহারও কাব্যে পূজা পায় নাই। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালার অশান্ত যৌবনের ললাটে রাজটীকা পরাইয়াছেন—বাঙ্গলার তরুণের চিত্তে বিদ্রোহের সুর ভরিয়া দিয়াছেন। কবি তাই বিদ্রোহীর পরম বন্ধু; তিনি তাহার তৃষ্ণায় জল, অন্ধকারে আলো, অবসাদে আশা, সন্দেহে বিশ্বাস, ভয়ে উদ্দীপনা, শোকে সান্ত্বনা; তিনি তাহার দুর্গম একলা পথের প্রিয়তম সঙ্গী।

কিন্তু বলিতে বলিতে আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। রবীন্দ্রনাথকে বিদ্রোহীরূপে দেখিতে আমাদের কেন ভাল লাগে তাহার কারণ আমরা এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই বলিয়াছি। পরাধীন জাতি সর্ব্বাগ্রে বাঁধন ছিঁড়িতে চায়; সেই বাঁধন ছেঁড়ার মন্ত্র তাঁহার কাব্যে অপূর্ব্বসুরে রণিয়াছে। বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ তাই আমাদের এত প্রিয়। ভয়ের বাঁধনই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর বাঁধন। রবীন্দ্রনাথ চাহিয়াছেন এই ভয়ের বন্ধন হইতে জাতিকে মুক্ত করিতে। অত্যাচার ও অবিচারের কাছে মাথা কখনও নত করিও না—এই কথাই তিনি শিখাইয়া আসিতেছেন; তাঁহার কাব্যের মধ্যে যে বাণী মন্ত্রিত হইতেছে সেই বাণী হইতেছে মাভৈঃ বাণী।

দাও আমাদের অভয় মন্ত্র,
অশোক মন্ত্র তব !
দাও আমাদের অমৃত মন্ত্র,
দাও গো জীবন নব !
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
চিত্ত ভরিয়া লব !
মৃত্যুহরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব !*

ইহাই কবির নববর্ষে গান। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে গেলে পদে পদে আঘাত সহ্য করিতে হয়। ভীরু দেশ সে আঘাত সহিতে প্রস্তুত হইবে না—তাই তিনি আমাদের জন্য অভয় মন্ত্র প্রার্থনা করিয়াছেন। সত্যের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, মনুষ্যত্বের গৌরবের জন্য যাহাকে সংগ্রাম করিতে হইবে তাহাকে দুঃখের জন্যও প্রস্তুত হইতে হইবে। অন্যায় ও অত্যাচারকে আমরা যখন আঘাত করিব তখন তাহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে না ; আঘাত ফিরাইয়া দিবে। মুক্তির পথ তাই কোন দিনই শুভ্র নহে ; শহিদের রক্তে উহা চিরদিনই লাল ; মাতার অশ্রুজলে উহা সিক্ত ; উহা কঠিন এবং কণ্টকাকীর্ণ।

"সম্প্রতি রাশিয়া থেকে এসেচি—দেশের গৌরবের পথ যে কত দুর্গম তা অনেকটা স্পষ্ট ক'রে দেখ্‌লুম। যে অসহ্য দুঃখ পেয়েছে সেখানকার সাধকেরা পুলিশের মার তার তুলনায় পুষ্পবৃষ্টি। দেশের ছেলেদের ব'লো এখনও অনেক বাকি আছে—তা'য় কিছুই বাদ যাবে না। অতএব তারা যেন এখনই বল্‌তে সুরু না করে যে বড়ো লাগ্‌চে—সে কথা ব'ললেই লাঠিকে অর্ঘ্য দেওয়া হয়।"†

দুঃখ দেখিয়া যে ভয় করিবে কবি তাহাকে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছেন। "যদি তোর ভাবনা থাকে তবে তুই ফিরে যা না"—

* স্বদেশ ও সংকল্প।
† রাশিয়ার চিঠি।

ভীরুদের প্রতি ইহাই কবির অনুরোধ। দুঃখের জন্যই যে দুঃখকে বরণ করিতে হইবে এমন কথা কবি বলেন না; মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে গেলে দুঃখ আসিবেই আসিবে—এই জন্যই মুক্তির পথকে তিনি বেদনার পথ বলিয়াছেন। বেদনাকে যে এড়াইতে যাইবে সে সত্যকে পাইবে না—সত্যের সাধনা কঠিনের সাধনা। 'সর্ব্বনেশে' আসিয়া দ্বারের শিকল ভাঙিয়া যখন আমাদিগকে পাষাণ-কঠিন পথের বুকে লইয়া আসে তখনই সত্যের সহিত আমাদের পরিচয় আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথ জাতীয়-জীবনে এই 'সর্ব্বনেশে'কে আহ্বান করিয়াছেন; আমাদের ঘরের মধ্যে তিনি ঝড় আনিয়াছেন—কাঁদন দিয়া যে সাধন—আমাদিগকে সেই সাধনার মন্ত্র দিয়েছেন—আমাদিগকে তিনি মরণ-টানে টানিয়াছেন। কবি তাই শুধু গানের রাজা নহেন; বিদ্রোহীদের তিনি প্রাণের রাজা।

কিন্তু দেশ হইতে ভিক্ষুকের মনোবৃত্তি যত দিন লোপ না পাইবে ততদিন বিদ্রোহ জাতির চিত্তে আসন পাইবে না। অল্পে যাহার পরিতুষ্টি, বৃহৎ চিরদিনই তাহার নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিবে। তাহারাই সব পায় যাহারা সব হারাইতে পারে—যাহাদের মধ্যে আছে gambler's recklessness. ভিক্ষুক, পরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে; তাহার সম্বলের মধ্যে শুধু আবেদন আর নিবেদন। বিদ্রোহী নির্ভর করে আপনার শক্তির উপরে। সে সব পাইবার জন্য মরণ বরণ করিবে—তবুও অল্পে সন্তুষ্ট রহিবে না। তাহার শিরে "সব-হারাবার জয়মালা"। রবীন্দ্রনাথের বাণী—বিদ্রোহের বাণী। তিনি ভিক্ষুকের মনোবৃত্তি ভাঙিতে চাহিয়াছেন এবং তাহা অসহযোগ আন্দোলনের বহু পূর্ব্বে। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" ইহাই তাঁহার মন্ত্র। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের এই দিকটী আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

৩

পুণ্য হস্তে শাক-অন্ন তুলে দাও পাতে
তাই যেন রুচে,
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে
তাহে লজ্জা ঘুচে !
সেই সিংহাসন যদি অঞ্চলটি পাত,
কর স্নেহ দান !
যে তোমারে তুচ্ছ করে, সে আমারে, মাত:
কি দিবে সম্মান !*

যাহারা বিজেতার ঔদ্ধত্য লইয়া লুণ্ঠনকামনায় দেশমাতৃকার স্কন্ধে চাপিয়া রহিয়াছে তাহাদের নিকট অনুগ্রহ চাহিবার মত বিড়ম্বনা আর নাই। কবি তাই প্রথম হইতেই আবেদন আর নিবেদনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। 'ভিক্ষার চাল কাঁড়া হউক আর আকাঁড়া হউক নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিব'—এই মনোবৃত্তি হীনতার পরিচায়ক। ইহাতে জাত যায় অথচ পেট ভরে না। অনুগ্রহ চাওয়াটাই পৌরুষের অপমান। পৃথিবীতে সেই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগা যে কেবল গ্রহণ করে, দান করে না। তাহার উপর যাহারা আমাদেরই রক্তে পুষ্ট হইয়া প্রতিদিন আমাদিগকে ঘৃণা করিতেছে, অনাদরে আমাদিগকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতেছে, আমাদের মতকে নিত্য পদদলিত করিয়া চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারের পরিচয় দিতেছে—তাহাদের দ্বারে অনুগ্রহ চাওয়ার কথা

* স্বদেশ ও সংকল্প।

উঠিতেই পারে না। কবি শিখাইয়াছেন—বিজেতার অত্যাচার ও দাম্ভিকতাকে ঘৃণা করিতে।

> "ভীষণের দুর্বৃত্ততাকে আমরা ভয় করি, সেই ভয়ের মধ্যেও সম্মান আছে, কিন্তু কাপুরুষের দুর্বৃত্ততাকে আমরা ঘৃণা করি। বৃটিশ সাম্রাজ্য আজ আমাদের ঘৃণার দ্বারা ধিকৃত। এই ঘৃণায় আমাদের জোর দেবে—এই ঘৃণার জোরেই আমরা জিত্‌বো।"*

তারপর লাভের দিক দিয়াও খতাইয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই, বিদেশী অনুগ্রহ করিয়া যাহা আমাদিগকে দান করে তাহাতে ইষ্ট যত হয় তাহার অপেক্ষা ঢের বেশী হয় অনিষ্ট। আমরা ত কাহারও অনুগ্রহ চাহিনা—ইংরেজ দয়া করিয়া আমাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করে ইহাও ত আমরা চাহি না "Good government is no substitute for self-government." আমরা চাই সর্ব্ববিষয়ে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে, আমরা চাই নিজের দেশে সর্ব্বময় প্রভু হইতে। অনুগ্রহ করিয়া বিজেতা আমাদিগকে যাহা দান করিবে তাহা আমাদিগকে আদর্শে পৌছাইয়া দিবে না—আদর্শের কথা ভুলাইয়া দিবে। সাধারণ লোক অল্প কিছু পাইলে সন্তুষ্ট হয়, বৃহৎ লক্ষ্যের কথা ভুলিয়া যায়। বস্তুত বিদেশী আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া যাহা কিছু দান করে তাহা একেবারেই সদিচ্ছার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নহে; তাহা উৎকোচ দিয়া আমাদিগকে তাহাদের উৎকট অন্যায় ও অবিচার সম্বন্ধে অচেতন রাখিবার জন্যই। তাহারা আমাদিগকে যখন বড় বড় চাকুরি দান করে, দুই একটা হাঁসপাতাল অথবা ইস্কুল খুলিয়া দেয়, দরবার দিবসে কাঙাল-দুঃখীকে ঢোল পিটাইয়া খাওয়ায়, তখন আমাদের মধ্যে নির্ব্বোধ যাহারা, তাহারা মনে করে খুব পাইলাম; ভাবে ইংরাজ বড় দয়াবান! কিন্তু তাহারা যদি আপনাদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত, ইংরেজের এই অনুগ্রহের দানে সকলেই উপকৃত হইতেছে না মুষ্টিমেয় মানুষ উপকৃত হইতেছে? —তবেই তাহাদের

* রাশিয়ার চিঠি।

জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইতে বিলম্ব হইত না। এই জ্ঞানের উন্মেষ হইলে দেশ অনুগ্রহের স্বল্প দানে সন্তুষ্ট রহিবে না—সে চাহিবে পূর্ণ স্বাধীনতা, যাহা পাইলে সকল লোকের দুঃখ সকল কালের জন্য ঘুচিয়া যাইবে। জনসাধারণের এই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষাকে ঘুম পাড়াইবার জন্যই বিদেশী আমাদের কাছে দয়াবান সাজিয়া থাকে; এই জন্যই তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপকারের অভিনয়। 'The rich are charitable : they understand that they have to pay ransom for their riches.'* যে দুঃখ জগদ্দল পাথরের মত জাতির বুকের উপর চাপিয়া রহিয়াছে এবং তাহার জীবনী শক্তি হরণ করিতেছে—সে দুঃখ হইতেছে দারিদ্র্যের দুঃখ। শাসকগণের অনুগ্রহের দান এই দুঃখ হইতে আমাদিগকে মুক্তি দিবে না—আমাদের দুঃখকে আরও বাড়াইয়া তুলিবে মাত্র। সমস্যার সমাধান করিতে হইলে সমাজকে এমন একটা নূতন ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে হইবে, যেখানে দারিদ্র্য বলিয়া কিছু থাকিবে না। সমাজকে এই নূতন ভাবে গড়িবার পথে অন্তরায় হইয়া আছে মানুষের পরোপকার করিবার প্রবৃত্তি, দাতা হইবার ইচ্ছা। এই দান, এই অনুগ্রহ আমাদিগকে অত্যাচারীর প্রতি কৃতজ্ঞ করে, যে শৃঙ্খল আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে তাহাকেই সোহাগ করিতে শিখায়, অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার প্রয়োজন আছে এই কথাটা ভুলাইয়া দেয়। তাই বিদ্রোহী যে সে কখনও দুঃখীকে অনুগ্রহের দান লইতে উৎসাহিত করিবে না। তাহার কাজ হইবে প্রত্যেক দরিদ্র নরনারীকে অকৃতজ্ঞ, অশান্ত, অবাধ্য এবং বিদ্রোহী করিয়া তোলা। শাসকগণ অনুগ্রহ করিয়া টেবিল হইতে দু' এক খণ্ড রুটি ফেলিয়া দিবে এবং শাসিত কুকুরের মত লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতে করিতে তাহা গ্রহণ করিবে ইহা শাসক ও শাসিত উভয়কেই হীন

* Bernard Shaw : "Intelligent woman's Guide to Socialism."

করে। এই উৎকট বৈষম্যের মধ্যেও যাহার চিত্ত বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী হয় না—বুঝিতে হইবে তাহার মনুষ্যত্ব একেবারেই লোপ পাইয়াছে। "No ; a poor man who is ungrateful, unthrifty, discontented, and rebellious is probably a real presonality, and has much in him. He is at any rate a healthy protest."* তাই বিদ্রোহের প্রকৃত শত্রু কেহ যদি থাকে তবে সে হইতেছে বিজেতার অনুগ্রহের দান। সে দান যত বড়ই হউক না কেন—তাহা বিষ-কন্যার মত। তাহা মুগ্ধ করে কিন্তু মারে। সে যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের হাতে স্বর্গ তুলিয়া দেয় তবুও সেই স্বর্গকে নরক জ্ঞান করিতে হইবে। সে যদি আমাদের দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া চলে, আমাদের প্রত্যেককে চরম সুখের মধ্যে রাখিয়া দেয়, আমাদিগকে এক একটি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির করিয়া তুলে তবুও দূর হইতে ইহাকে নমস্কার কারতে হইবে—কারণ ইহা অনুগ্রহের দান। ইহার মধ্যে আমার নিজের কোন ব্যক্তিত্ব নাই, আমার নিজের কোন সৃষ্টি নাই।

> "জনগণের ভাগ্য যদি তাদের সম্মিলিত ইচ্ছার দ্বারাই সৃষ্ট ও পালিত না হয় তবে সেটা হয় খাঁচা, দানাপানি সেখানে ভালো মিলতেও পারে, কিন্তু তাকে নীড় বলা চলে না, সেখানে থাকতে থাকতে পাখা যায় আড়ষ্ট হয়ে। এই নায়কতা শাস্ত্রের মধ্যে থাক গুরুর মধ্যেই থাক, আর রাষ্ট্রনেতার মধ্যেই থাক, মনুষ্যত্বহানির পক্ষে এমন উপদ্রব কিছুই নেই।"†

এই জন্যই বিজেতা যখন খোলাখুলি ভাবে বলে, 'কিছু দিব না', তখন সে আমাদিগের বন্ধুর কাজ করে, সে তখন অনুগ্রহ দিয়া মুক্তিপিপাসু অশান্তহৃদয়কে ঘুম পাড়ায় না—আঘাত দিয়া আমাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর করে।

* Oscar Wilde : "The Soul of Man under Socialism."

† রাশিয়ার চিঠি।

ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে
মোদের বাঁধন টুট্‌বে,
ওদের আঁখি যত রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুট্‌বে।*

বিদ্রোহী যে—তাহাকে সব সময়ে তাই বলিতে হইবে, ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।

এই সত্য রবীন্দ্রনাথের কাছে অনেক দিন পূর্ব্বেই ধরা দিয়াছিল। 'শিক্ষা-সংস্কার' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন,

"গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত সিনেটে, সিণ্ডিকেটে বাঙ্গালী থাকিলেই যে বিদ্যাশিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে রহিল তাহা আমি মনে করিনা। গভর্ণমেণ্টের আমাদের কাছে জবাবদিহি না থাকিয়া দেশের লোকের কাছে জবাবদিহি থাকা চাই। আমরা গভর্ণমেণ্টের সম্মতির অধীনে যখন বাহ্যস্বাতন্ত্র্যের একটা বিড়ম্বনা লাভ করি তখনি আমাদের বিপদ সব চেয়ে বেশী। তখন প্রসাদলব্ধ সেই মিথ্যা স্বাতন্ত্রের মূল্য যাহা দিতে হয় তাহাতে মাথা বিকাইয়া যায়। বিশেষতঃ দেশী লোককে দিয়াই দেশের মঙ্গল দলন করা গর্ণভেমণ্টের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নহে, নহিলে এ দেশের দুর্গতি কিসের? অতএব চাকরির অধিকার নহে, মনুষ্যত্বের অধিকারের যোগ্য হইবার প্রতি যদি লক্ষ্য রাখি, তবে শিক্ষাসম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য চেষ্টার দিন আসিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশের লোককে শিশুকাল হইতে মানুষ করিবার সদুপায় যদি নিজে উদ্ভাবন এবং তাহার উদ্যোগ যদি নিজে না করি, তবে আমরা সর্ব্বপ্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইব—অন্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, বুদ্ধিতে মরিব, চরিত্রে মরিব—ইহা নিশ্চয়।"

আমরা যতক্ষণ ভিক্ষুকের বেশে বিজেতার দ্বারে অনুগ্রহ লাভের আশায় দাঁড়াইয়া থাকিব ততক্ষণ তাহার নিকট হইতে ঘৃণাই লাভ

* জাতীয় সঙ্গীত।

করিব—অবজ্ঞামিশ্রিত করুণা পাইব। যে নিজেকে সম্মান করে না, যাহার হাতে ভিক্ষার ঝুলি—কে তাহাকে সম্মান দান করিবে? মানুষ সম্মান করে শক্তিমানকে। "সওয়ার সিংহের পিঠে চড়ে না, ঘোড়াকেই লাগামে বাঁধে।" কবি তাই প্রথম হইতেই পরমুখাপেক্ষী দুর্ব্বল জাতিকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে চাহিয়াছেন।

"ইংরেজের মধ্যে যাহা সকলের চেয়ে ভাল এবং সকলের চেয়ে বড় তাহা আরামে গ্রহণ করিবার নহে, তাহা আমাদিগকে জয় করিয়া লইতে হইবে। ইংরেজ যদি দয়া করিয়া আমাদের প্রতি ভাল হয় তবে তাহা আমাদের পক্ষে ভাল হইবে না। আমরা মনুষ্যত্ব দ্বারা তাহার মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত করিয়া লইব। ইহা ছাড়া সত্যকে গ্রহণ করিবার আর কোন সহজ পন্থা নাই। এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইংরেজের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা ইংরেজের কাছেও কঠিন দুঃখেই উপলব্ধ হইয়াছে, তাহা দারুণ মন্থনে মথিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার যথার্থ সাক্ষাৎ লাভ যদি করিতে চাই তবে আমাদের মধ্যেও শক্তির আবশ্যক।"*

এই প্রবন্ধের অপর একস্থানে তিনি লিখিতেছেন,

"ভারতবাসী যতক্ষণ পর্য্যন্ত ত্যাগশীলতার দ্বারা শ্রেয়কে বরণ করিয়া না লইবে, ভয়কে, স্বার্থকে, আরামকে সমগ্র দেশের হিতের জন্য ত্যাগ করিতে না পারিবে, ততক্ষণ ইংরেজের কাছে যাহা চাহিব তাহা ভিক্ষা চাওয়াই হইবে এবং যাহা পাইব তাহাতে লজ্জা ও অক্ষমতা বাড়িয়া উঠিবে। নিজের দেশকে যখন আমরা নিজের চেষ্টা, নিজের ত্যাগের দ্বারা নিজের করিয়া লইব, যখন দেশের শিক্ষার জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য আমাদের সমস্ত সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়া দেশের সর্ব্বপ্রকার অভাব মোচন ও উন্নতি সাধনের দ্বারা আমরা দেশের উপর আমাদের সত্য অধিকার স্থাপন করিয়া লইব, তখন দীনভাবে ইংরেজের কাছে দাঁড়াইব না। তখন ভারতবর্ষে আমরা ইংরাজ-রাজের সহযোগী হইব,

* সমাজ।

তখন আমাদের সঙ্গে ইংরেজকে আপস করিয়া চলিতেই হইবে, তখন আমাদের পক্ষে দীনতা না থাকিলে ইংরেজের পক্ষেও হীনতা প্রকাশ হইবে না।"

মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিবার অনেক দিন পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন,

"যাহার অবস্থা হীন সে যেন বিনা আমন্ত্রণ, বিনা আদরে সৌভাগ্যশালীর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে না যায়—তাহাতে কোন পক্ষেরই মঙ্গল হয়না। ইংরাজ এদেশে আসিয়া ক্রমশঃই নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিতে থাকে—তাহার অনেকটা কি আমাদের হীনতা বশতঃ নহে? সেইজন্যও বলি, অবস্থা যখন এতই মন্দ তখন আমাদের সংস্রব সংঘর্ষ হইতে ইংরাজকে রক্ষা করিলে তাহাদেরও চরিত্রের এমন দ্রুত বিকৃতি হইবে না। সে উভয়পক্ষের লাভ।"*

রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা—সকল ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ জড়তা এবং পরমুখাপেক্ষিতা ঘুচাইতে চাহিয়াছেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তিনি আনিতে চাহিয়াছেন পৌরুষের দৃপ্ত মহিমা, শক্তির সমুজ্জ্বল গরিমা, বীর্য্যের অবাধ প্রকাশ, প্রাণের বন্ধনহীন প্রবাহ।

"কিন্তু আমাদের বলবার আজ সময় এসেচে যে, অশক্তের শক্তি এখনই যদি না জাগে, তাহ'লে মানুষের পরিত্রাণ নেই, কারণ শক্তিমানের শক্তিশেল অতিমাত্র প্রবল হ'য়ে উঠেচে—এতদিন ভূলোক উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছিলো, আজ আকাশকে পর্য্যন্ত পাপে কলুষিত ক'রে তুল্‌লে, নিরুপায় আজ অতিমাত্র নিরুপায়—সমস্ত সুযোগ সুবিধা আজ কেবল মানব সমাজের একপাশে পুঞ্জীভূত, অন্যপাশে নিঃসহায়তা অন্তহীন।"†

যে ক্ষুদ্র আরামপ্রিয়তা আমাদিগকে গৃহকোণে বাঁধিয়া রাখে, আম কাঁঠালের বাগান এবং বাঁশঝাড়ের মধ্যে বসিয়া কেবল ঘরকন্না করিতে

* রাজাপ্রজা

† রাশিয়ার চিঠি।

শেখায়, আমাদের শক্তির প্রকাশকে অবরুদ্ধ করে, পরের দ্বারে ভিক্ষা করিতে আমাদিগকে প্ররোচনা দেয়, তাহাকে তিনি কখনও ক্ষমা করেন নাই। ঠাণ্ডা হও, ছায়ায় থাক, গৃহের দ্বার রুদ্ধ কর, ডাবের জল খাও, নাসারন্ধ্রে তৈল দাও এবং স্ত্রী পুত্র পরিবার ও প্রতিবেশীদিগকে লইয়া নিরুপদ্রবে সুখ-নিদ্রার আয়োজন কর—এই পরামর্শ প্রবীণ পাকার পরামর্শ। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবীণ পাকার জীর্ণ শাসনকে ধূলিসাৎ করিবার জন্য সবুজকে আহ্বান করিয়াছেন—যে সবুজ দুরন্ত, জীবন্ত, অশান্ত, প্রচণ্ড, প্রমত্ত, প্রমুক্ত এবং অমর।

"ঐ যে প্রবীণ, ঐ যে পরম পাকা,
চক্ষুকর্ণ দুটি ডানায় ঢাকা,
ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায়!
আয় জীবন্ত, আয়রে আমার কাঁচা।"

"যদি বাঁচবই তবে বাঁচার মত করেই বাঁচতে হবে"—ইহাই কবির কথা। "To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all."* কিন্তু বাঁচার মত বাঁচিতে জানে তাহারাই যাহারা মরিতে জানে, যাহারা নির্ভীক, বে-পরোয়া এবং বে-হিসাবী।

"হয় মরিব নয় বাঁচিব, এই কথাই ভাল। মরিবার ভয়ে বাঁচিয়া থাকিবার দরকার নাই। ক্রমোয়েল যখন ইংলণ্ডের দাসত্ব-রজ্জু ছেদন করিতেছিলেন তখন তিনি মরিতেও পারিতেন বাঁচিতেও পারিতেন, ওয়াশিংটন যখন আমেরিকার স্বাধীনতার ধ্বজা উঠাইয়াছিলেন তখন তিনি মরিতেও পারিতেন বাঁচিতেও পারিতেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এমন কেহ মরে কেহ বাঁচে—তাহাতে আপত্তি কি? নিরুদ্যমই প্রকৃত মৃত্যু। আমরা না হয় বাঁচিব, না হয় মরিব—তাই বলিয়া কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া

* Oscar Wilde.

দাদামশায়ের কোলের কাছে বসিয়া সমস্ত দিন উপকথা শুনিতে পারিব না।"†

এইবার আমরা এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব। বিদ্রোহের পথে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল অন্তরায় ভিক্ষুকের মনোবৃত্তি। রবীন্দ্রনাথ সেই ভিক্ষুকের মনোবৃত্তির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। 'সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্' ইহাই তাঁহার মন্ত্র; ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি—যাহা ভূমা, যাহা মহান্, তাহাই সুখ, অল্পে সুখ নাই—ইহাই তাঁহার বাণী। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—কোন মহৎ সত্যই বলহীনের দ্বারা লভ্য নহে ইহাই তাঁহার কথা। শান্তির প্রতি তাঁহার মোহ নাই; তাঁহার 'ফাল্গুনী'র কবি বলে, 'শান্তির উপরে ত আমাদের একটুও আসক্তি নেই, আমরা যে বৈরাগী'। তিনি চাহিয়াছেন—অপর্য্যাপ্ত প্রাণ, অবাধ জীবন, সর্ব্বপ্রকার দীনতা ও হীনতা হইতেই মুক্তি।

বাঁধন যত ছিন্ন কর আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে!
আকুল প্রাণের সাগর-তীরে
ভয় কিরে তোর ক্ষয়-ক্ষতিরে?
যা আছে রে সব নিয়ে তোর
ঝাঁপ দিয়ে পড়্ অনন্তে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।

† সমাজ।

কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার চাক্‌চিক্য আমাদিগকে যতদিন অভিভূত করিয়া রাখিবে, স্বদেশের ঠাকুর ফেলিয়া বিদেশের কুকুর পূজিবার হীন মনোবৃত্তি যতদিন না লোপ পাইবে ততদিন ভিক্ষুকের মনোবৃত্তি ঘুচিবে না—বিদেশীর শৃঙ্খলকে সোহাগ করিবার প্রবৃত্তি যাইবে না। তাই রবীন্দ্রনাথ প্রথম হইতেই পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহ ঘুচাইবার প্রয়োজন অতি তীব্রভাবে অনুভব করিয়াছিলেন।

এই পশ্চিমের কোণে রক্তরাগ রেখা
নহে কভু সৌম্যরশ্মি অরুণের লেখা
তব নব প্রভাতের! এ শুধু দারুণ
সন্ধ্যার প্রলয়দীপ্তি! চিতার আগুন
পশ্চিম সমুদ্রতটে করিছে উদ্গার
বিস্ফুলিঙ্গ—স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার
মশাল হইতে ল'য়ে শেষ অগ্নিকণা!

পাশ্চাত্যের সভ্যতা সর্ব্বনেশে কেন? কারণ ইহার প্রতিষ্ঠা লোভ এবং স্বার্থ-পরতার উপরে; দরিদ্রের রুধিরে ইহা পরিপুষ্ট; বিলাসের দ্বারা ইহা লালিত। ইহার ললাটে লেখা রহিয়াছে বৈষম্য, দস্যুতা, হিংসা। লক্ষ লক্ষ শিশু অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতেছে; তাহারা অর্দ্ধনগ্ন; তাহাদের মাথা রাখিবার উপযুক্ত ঠাঁই নাই। এই সব হতভাগ্যদের বাসস্থান, বস্ত্র এবং আহারের ব্যবস্থা করিবার জন্য যে অর্থ ব্যয় করিবার প্রয়োজন ছিল তাহা ব্যয়িত হইতেছে সোনার ও

হীরার অলঙ্কার, আতরের শিশি, সিল্কের সাড়ী, মোটর গাড়ী, সিগার, শ্যাম্পেন ইত্যাদি বিলাস দ্রব্যের পিছনে। সমাজের প্রতি দশ জনে একজন বিলাসের ক্রোড়ে অলসভাবে জীবন কাটাইয়া দিতেছে, বাকী নয় জন সারা জীবন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করিতেছে এই একজন অলসের বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য। মানুষে মানুষে এই যে উৎকট বৈষম্য ইহা পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল।

> খুব সম্ভব দুর্দ্দান্ত রাজার শাসনকালে ইজিপ্টের পিরামীড অনেকগুলি প্রস্তর এবং অনেকগুলি হতভাগ্য মানবজীবন দিয়ে রচিত হয়। এখনকার এই পরম-সুন্দর অভ্রভেদী সভ্যতা দেখে মনে হয় এও উপরে পাষাণ নীচে পাষাণ এবং মাঝখানে মানবজীবন দিয়ে গঠিত হচ্ছে।*

এই সভ্যতাকে রবীন্দ্রনাথ 'ভদ্রবেশী বর্ব্বরতা' বলিয়াছেন; ইহার তুলনা করিয়াছেন দয়াহীন নাগিনীর সহিত।

দয়াহীন সভ্যতা-নাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে,
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি' তীব্র বিষে।
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত,—লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম,—প্রলয়-মন্থন-ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্ব্বরতা উঠিয়াছে জাগি'
পঙ্কশয্যা হ'তে।†

অলস ধনীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বর্ত্তমান সভ্যতার স্বরূপ আমরা যখন ভাল করিয়া উপলব্ধি করি তখন ইহাকে 'ভদ্রবেশী বর্ব্বরতা' ভিন্ন আর কি বলিতে ইচ্ছা করে? এই সভ্যতার উপর তলায় থাকিয়া যাহারা সমাজে প্রভুত্ব করিতেছে তাহারা কাহারা? তাহারা এমন এক শ্রেণীর লোক যাহারা সমাজের কোন সম্পদকে সৃষ্টি করিতেছে

* সমাজ।
† স্বদেশ।

না অথচ সমাজের সকল সম্পদ ভোগ করিতেছে, যাহারা সমাজের কোন সেবা করিতেছে না অথচ অন্যের সেবা নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতেছে। এই সকল লোক চোরের সামিল অথবা চোরেরও অধম। কারণ চোর ডাকাত দশ বৎসরে দেশের যতখানি ক্ষতি না করিতে পারে ইহারা তাহার অপেক্ষা ঢের বেশী ক্ষতি করিতেছে এক বৎসরে। কিন্তু মজার বিষয় হইতেছে, আমরা চোর ডাকাত জালিয়াতকে জেলে পাঠাই কিন্তু এই সকল অলস, অকেজো, নিষ্কর্ম্মা, পরশ্রমজীবী ধনীদিগকে জেলে পাঠানো দূরের কথা, লক্ষ্মীর বরপুত্র বলিয়া ইহাদিগকে সম্মান করি। এমন হইবারই কথা; কারণ পার্লামেণ্টে যাহারা আইন করিয়া থাকে তাহারা অধিকাংশই ধনীর সন্তান; ধনী ধনবানের স্বার্থোদ্ধত অবিচারকে সমর্থন করিবে—ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? ইহারা পুরুষ মৌমাছির মত। পুরুষ মৌমাছিরা মধু আহরণ করে না; সেই কাজ করে ক্লান্তিহীন স্ত্রী মধুমক্ষীরা। পুরুষেরা শুধু চাকে বসিয়া বসিয়া ঘুমায় আর মধু খায়। আশ্চর্য্যের কথা, ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা বলিয়া ইহারাই সমাজে সম্মান পায়—কারণ ধনী পিতৃ-পুরুষের কল্যাণে ইহাদের ব্যাঙ্কে অর্থ ও গ্রামে জমিদারী আছে। কিন্তু লাঙলের মুখে যাহারা ধরণীকে শস্যশালিনী করিতেছে, কারখানায় সারাদিন হাতুড়ি পিটাইয়া ক্ষুদ্র আলপিন হইতে বিশাল ইঞ্জিন গড়িতেছে, তাহারা পায় ছোটলোক, চাষা, ইতর ইত্যাদি আখ্যা; তাহাদের স্থান সকলের নীচে, সকলের পিছে, অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিতের সমাজে।

> চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে তাদের সংখ্যা বেশী, তা'রাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তা'রা পালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে কম প'রে কম শিখে সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশী তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশী তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা

খেয়ে মরে, জীবনযাত্রার জন্ম যত কিছু স্থযোগ সুবিধে, সব কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।*

যে সভ্যতা এই উৎকট, বীভৎস এবং অস্বাভাবিক সামাজিক ব্যবস্থাকে সৃষ্টি ও সমর্থন করে এবং প্রশ্রয় দেয় তাহাকে ভদ্রবেশী বর্ব্বরতা ভিন্ন আর কোন্ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে!

বর্ব্বরতা প্রকাশ কি শুধু এইখানেই? শক্তিমদমত্ত ধনদৃপ্ত পশ্চিম আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র আপনার জয়ধ্বজা উড়াইয়া দিয়াছে। জিরাফ্ যেমন আপনার দীর্ঘ গ্রীবা বিস্তার করিয়া বৃক্ষের কোমল পল্লবগুলিকে মুড়াইয়া খাইয়া ফেলে পশ্চিমের প্রতাপশালী জাতিগুলিও তেমনি করিয়া পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জাতিগুলিকে শুষিয়া খাইতেছে। উৎকট ধনলোভে পাগল হইয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা অতীতে যাহা করিয়াছে এবং আজও যাহা করিতেছে তাহার ফলে ভারতবর্ষ আজ শ্মশান, আফ্রিকা কাফ্রীদের হাহাকারে পরিপূর্ণ, বিশ্ব যাতনায় আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতেছে। ইংলণ্ডে মদ্যের অবাধ ব্যবসা যখন আইনের দ্বারা বন্ধ করা হইল তখন ধনীর দল নিজের দেশে মদ্যব্যবসায়ে অর্থ খাটাইবার সুবিধা না পাইয়া আফ্রিকার গ্রামে গ্রামে সুরার দোকান খুলিয়া দিয়াছে। সেই সুরা বিক্রয়ের অর্থে ইংলণ্ড ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে সত্য কিন্তু মদের বিষ খাইয়া লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণকায় নরনারী অকালে পৃথিবী ছাড়িয়া গিয়াছে। ইহাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী কোন্ সভ্যতা? পাশ্চাত্যের ধনকুবেরগণ আফ্রিকাকে মাতালের কঙ্কালে পূর্ণ করিয়া ফেলিত যদি দাস-ব্যবসায়কে তাহারা ধনাগমের আরও প্রশস্ত পথ বলিয়া বিবেচনা না করিত।

'They would have made Africa a desert with the bones of drunkards had they not

* রাশিয়ার চিঠি।

> discovered that more profit could be made by selling men and women than by poisoning them. The drink trade was rich, but the slave trade was richer.*

কত না শৃঙ্খলাবদ্ধ রোরুদ্যমান নিগ্রো নরনারীকে জাহাজ বোঝাই করিয়া আমেরিকায় প্রেরণ এবং গোরু ঘোড়ার মত বিক্রয় করা হইয়াছে! এইভাবে মানুষ বিক্রয়ের ফলে কত যে ইংরেজ নরনারী অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। ব্রিষ্টলের মত সমৃদ্ধিশালী সহরগুলির প্রতিষ্ঠা এই সব হতভাগ্য নিগ্রোনরনারীর অশ্রুজলের উপর, ঠিক যেমন ল্যাঙ্কাশায়ারের মত সহরগুলির ঐশ্বর্য্যের মূলে রহিয়াছে কোটী কোটী ভারতবাসীর অসহনীয় দারিদ্র্য।

> Huge profits were made by kidnapping shiploads of negroes and selling them as slaves. Cities like Bristol have been built upon that black foundation.†

ভারতবর্ষের মত বিপুল সাম্রাজ্য, রোডেশিয়ার মত প্রকাণ্ড দেশ এবং বোর্ণিও দ্বীপের মত বিশাল বহুলোকপূর্ণ দ্বীপগুলি আজ বৃটিশ সাম্রাজ্যের পদতলে লুটাইতেছে। ইহার মূলেও পাশ্চাত্য ধনকুবেরগণের উৎকট অর্থলালসা, তাহার সঙ্গে মিলিয়াছে ক্ষত্রিয়ের কৃপাণ। ইউরোপের ধনশালী জাতিগুলি দেখিয়াছে, নিজের দেশে মাল বিক্রয়ের কোন সম্ভাবনা নাই; রাশি রাশি মাল অন্য কোন সভ্য জাতির দেশে বিকাইবে সে পথও বন্ধ; কারণ আত্মরক্ষার জন্য বিদেশী মালের উপর শুল্ক বসাইবার ক্ষমতা সকল স্বাধীন দেশেরই আছে। সে ক্ষমতা নাই কেবল আমাদের মত অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল দেশের। তাই সভ্য জাতিগুলি নিজেদের দেশের মাল লইয়া ধাইয়া চলে

* Bernard Shaw: "Intelligent Woman's Guide to Socialiam."

† Ibid

অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলদের দেশে। জাহাজে কেবল মাল থাকে না, কামানও থাকে। কিছুদিন নির্ব্বিবাদে বাণিজ্য চলে। তাহার পর জাহাজে পর জাহাজ যত আসিতে আরম্ভ করে শ্বেতকায় বণিকগণের জন্য কুঠি নির্ম্মাণের ততই আবশ্যক হইয়া পড়ে। যথাকালে কুঠি নির্ম্মিত হয়; বাণিজ্যের নামে দস্যুতা চলে; উৎপীড়নে ক্ষিপ্ত দেশীয় লোকের সঙ্গে কোম্পানীর তখন সংঘর্ষ বাধে; দু একজন মিশনারী হয়ত জখম হয়। নিরাপদে যাহাতে বাণিজ্য করিতে পারে তাহার জন্য শ্বেতকায় বণিকের দল তখন স্বদেশে সাহায্য চাহিয়া পাঠায়। 'হোম্' গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধ-জাহাজ পাঠাইয়া দেয়; অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্ত চলে। তদন্তের ফলে যে বিবরণী বাহির হয় তাহাতে লেখা থাকে, দেশের লোকগুলি বর্ব্বর; তাহাদের হাত হইতে বাণিজ্যকে বাঁচাইতে হইলে সুসভ্য শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই। তখন সভ্য শাসনতন্ত্রের সাথে আসে ডাকঘর, পুলিশ সৈন্যবাহিনী এবং রণপোত; দেখিতে দেখিতে সেই দেশ সুসভ্য সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। জগতের শিরে আজ ইউরোপের বিজয়ধ্বজা উড়িতেছে। ইহার মূলে ইউরোপের বারুদ এবং কলকারখানা। কবির 'মুক্তধারা'য় উত্তর-কূটের নাগরিক তাই বলিতেছে, "ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রে বৈশ্যের যন্ত্রে যে মিলিয়েচে, জয় সেই যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়।" পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে আজ যে উৎকট ধনলোভ এবং যন্ত্রের প্রতি অস্বাভাবিক অনুরাগ প্রকাশ পাইতেছে "বিভূতি" তাহারই প্রতীক।

ইউরোপে এত বড় যে যুদ্ধ হইয়া গেল তাহার মূলেও লোভ এবং স্বার্থ। ভূমধ্যসাগরের তীরে আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ হাটগুলি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন এবং ইটালি নিজেদের মধ্যে বাঁটিয়া লইয়াছে। ফ্রান্স লইয়াছে আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া, সুদান; স্পেন লইয়াছে মরোক্কো; ইটালি লইয়াছে ত্রিপোলি এবং ইংলণ্ড লইয়াছে মিশর। হতভাগ্য জার্ম্মাণ বণিক্ অতিরিক্ত মাল লইয়া যায় কোথায়? হয় তাহাকে

কলকারখানা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে—কিন্তু তাহা হইলে ধ্বংস অনিবার্য্য ; নতুবা তাহাকেই আফ্রিকায় মাল বেচিবার জন্য হাট খুঁজিয়া লইতে হইবে—কিন্তু সেই হাটই বা কোথায় ? ১৯১৪-১৯১৮ সালের পাঞ্চবার্ষিক যুদ্ধের মূলে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত, লোভে লোভে সংঘর্ষ। একদিকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং ইটালির ধনকুবেরগণের সর্ব্বগ্রাসী লোভ—অপরদিকে জার্ম্মাণ ধনীদের উৎকট অর্থলালসা। এই লোভের অনলে দুই পক্ষের ধনীরা কত না মানুষকে ইন্ধনরূপে নিক্ষেপ করিয়াছে! রাইফেল বহিবার ক্ষমতা যে পুরুষের আছে তাহাকেই স্ত্রীপুত্রগৃহ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ মারিতে যাইতেই হইবে—ইহাই রাজ্যের আইন। গোরু ছাগল যেমন করিয়া অসহায়ভাবে কসাইখানায় যায় তাহাদিগকে তেমনি করিয়াই মৃতদেহে পরিপূর্ণ সমরক্ষেত্রে ছুটিতে হইয়াছে। দুইপক্ষের লোকই নিশীথরাত্রে উড়ো জাহাজ হইতে ঘুমন্ত গ্রামে বোমা নিক্ষেপ করিয়া অসংখ্য শিশু হত্যা করিয়াছে, নদীর জলে বিষ মিশাইয়াছে এবং ইহার জন্য বীর বলিয়া সম্মানিত হইয়াছে। জাতিপ্রেমের নামে শিশু হত্যায়, নারীহত্যায় ত' দোষ নাই!

লজ্জা সরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্ম্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।*

বিধাতার সুন্দরতম সৃষ্টি মানুষ, কিন্তু তাহার আজ একি বীভৎস রূপ! আধুনিক সভ্যতার কারখানা হইতে যাহারা বাহির হইয়া আসিতেছে তাহাঁদের সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য কোথায়? তাহারা জানে শুধু কেমন করিয়া টাকা লুটিতে হয় এবং কামান দাগিতে হয়। সেনাপতি হইয়া তাহারাই ভারতবর্ষে জালিয়ানওয়ালাবাগের সৃষ্টি করিতেছে; আয়ার্লাণ্ডের গ্রামে গ্রামে আগুন জ্বালাইতেছে; বণিক হইয়া তাহারাই দস্যুর মত অন্যদেশের উপর জোর করিয়া

* স্বদেশ।

মাল চাপাইয়া দিতেছে ; বিচারক হইয়া তাহারাই পিকেটিং করার অপরাধে অহিংসা-মন্ত্রের উপাসক স্বেচ্ছাসেবকগণকে কারাগারে পাঠাইতেছে ; পুলিশ হইয়া তাহারাই সত্যাগ্রহীর শিরে নির্ম্মমভাবে লাঠি চালাইতেছে ; রাষ্ট্রের কর্ণধার হইয়া বণিকের স্বার্থরক্ষার জন্য তাহারাই অর্ডিন্যান্সের পর অর্ডিন্যান্সের স্রষ্টা হইতেছে ; সংবাদপত্র-সেবী হইয়া ধনীর টাকা খাইয়া তাহারাই মিথ্যার জয়গান গাহিতেছে ; শিক্ষক হইয়া রাজভক্তির নামে তাহারাই ভীরুতা শিখাইতেছে ; যাজক হইয়া তাহারাই মানুষকে শান্তির নামে জড়তা ও কাপুরুষতার উপাসক হইতে বলিতেছে।

(কবির 'মুক্তধারা' পাশ্চাত্য সভ্যতার এই হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে অভিযান। একদিকে যন্ত্ররাজ বিভূতি—যিনি বহু বৎসরের চেষ্টায় লৌহযন্ত্রের বাঁধ তুলিয়া মুক্তধারার ঝরণাকে বাঁধিয়াছেন। আর এক দিকে অভিজিৎ—ঘরের শঙ্খ যাহাকে ঘরে ডাকে নাই দূরকে নিকট করিবার মন্ত্র লইয়া যে আসিয়াছে। "বিভূতি" কলকারখানাবহুল শক্তিমদমত্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার (Western Imperialism) প্রতীক ! সে যন্ত্র বেদীর উপর তৃষ্ণারাক্ষসীর প্রতিষ্ঠা করিবে। সে মানুষ বলি দিবে তৃষ্ণা-দানবীর কাছে। এই তৃষ্ণাদানবী কে ? "সে যত খায় তত চায় ; তার শুষ্ক রসনা ঘি-খাওয়া আগুনের শিখার মত কেবলি বেড়ে চলে।" যন্ত্ররাজ বিভূতি 'ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রে, বৈশ্যের মন্ত্রে মিলিয়েচে'। অভিজিৎ বিভূতির অত্যাচার ও ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ; মুক্তধারার বাঁধকে ভাঙ্গাই তাহার সাধনা। এই সাধনায়, কবি শেষ পর্য্যন্ত অভিজিৎকে জয়ী করিয়াছেন, কিন্তু সেই জয় মৃত্যুবরণ করিয়া। অভিজিৎ যন্ত্রাসুরকে আঘাত করিলেন, যন্ত্রাসুরও তাঁহাকে সেই আঘাত ফিরাইয়া দিল। তখন মুক্তধারা সেই আহত দেহকে মায়ের মত কোলে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।)

পাশ্চাত্য সভ্যতার আড়ম্বর, কপটতা, কদর্য্যতা, শক্তির অহঙ্কার এবং উৎকট ধনলিপ্সার বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহ প্রকাশ পাইয়াছে

'রক্তকরবী' নামক আর একখানি নাটকের মধ্য দিয়ে। এই নাট্যব্যাপার যে নগরকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহার নাম যক্ষপুরী। যক্ষপুরীর শ্রমিকেরা মাটির তলা হইতে সোনা তুলিবার কাজে ব্যস্ত। সেখানকার মানুষেরা কেবল মরা ধনের শব-সাধনা করে। তারা বলে, "সোনার তালের তাল-বেতালকে বাঁধতে পারলে পৃথিবীকে পাবো মুঠার মধ্যে।" যক্ষপুরীর রাজা অত্যন্ত জটিল জালের আবরণের আড়ালে বাস করে। এই রাজা হইতেছে লোভ ও জোরের প্রতীক। সে বলে, 'আমি হয় পাবো, নয় নষ্ট করবো।' তার মধ্যে কেবল জোরই আছে—আনন্দ নেই, সৌন্দর্য্য নেই, প্রেম নেই। রাজা প্রকাণ্ড মরুভূমির মত—তার মধ্যে আছে কেবল তৃষ্ণার দাহ। সে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অথবা মানুষের প্রেমের মধ্যে আপনাকে ধরা দেয় না—সে সকলের নিকট হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। যেখানে ঐশ্বর্য্যের সাধনাই একমাত্র সাধনা, সব কিছুকে মুঠার মধ্যে পাওয়াই যেখানে একমাত্র আকাঙ্ক্ষা সেখানে সৌন্দর্য্য, প্রেম অথবা আনন্দ কোন কিছুরই স্থান থাকিতে পারে না। যক্ষপুরীর লোকে বলে, আমরা নিরবকাশ-গর্ত্তের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছি'। সেখানকার রাজা বলে, 'হায় রে, আর সব বাঁধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না।' সে বলে 'আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত।'

যক্ষপুরীর হাওয়ায় সুন্দরের প্রতি অবজ্ঞা জাগায়—ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বনেশে। সেখানে নবাঙ্কুরের মাধুর্য্য নাই, পল্লবের মর্ম্মর ধ্বনি নাই, আছে 'শান-বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্গধ্বনি।' সেখানকার আশাহীন আলোকহীন জঠরের মধ্যে একবার তলাইয়া গেলে আর নিস্তার নাই। গ্রামের লোক সেখানে আসিয়া ধনীর ধনোৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত হয়। রক্তকরবীর বিশু বলিতেছে, 'গাঁয়ে ছিলুম মানুষ; এখানে হ'য়েছি দশ-পঁচিশের ছক। বুকের উপর দিয়ে জুয়াখেলা চ'লছে।' রিক্ত, হৃতসর্ব্বস্ব মানুষ

যাহাতে আজীবন শান্তভাবে থাকিয়া গোরু ঘোড়ার মত ধনীর ঐশ্বর্য্য সৃষ্টি করিয়া যায় যক্ষপুরীতে তাহার সকল ব্যবস্থাই আছে। রক্তকরবীর ফাগুলাল তাহার স্ত্রী চন্দ্রাকে বলিতেছে, 'দেখোনি ওদের মদের ভাঁড়ার, অস্ত্রশালা আর মন্দির একেবারে গায়ে গায়ে।' সেখানে সর্দ্দার আছে, ধর্ম্মের কথা বলিয়া শ্রমিকদিগকে অবিচলিত রাখিবার জন্য কেনারাম গোঁসাই আছে—সেখানে মানুষকে অমানুষ করিবার জন্য কোন ব্যবস্থারই ত্রুটী নাই। (বলা বাহুল্য, যক্ষপুরী উৎকট ধনলিপ্সা এবং উদ্ধত পশুবলের দ্বারা পরিপুষ্ট ও পরিচালিত পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক।) কবি যন্ত্রের উৎকট ও অস্বাভাবিক আধিপত্য এবং বাহুবলের ঔদ্ধত্যের মৃত্যু ঘটাইয়াছেন নন্দিনীর হাতে। যেখানে প্রাণের, যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা—নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্য্যের। যক্ষপুরীর ভয়ঙ্কর রাজা আপনার উদ্ধত নিশান ভাঙিয়া অবশেষে নন্দিনীর হাতে আত্মসমর্পণ করিল। সৌন্দর্য্য দিয়া কবি অসুন্দরকে ভাঙিয়াছেন, প্রেম দিয়া লোভের ও স্বার্থপরতার অবসান ঘটাইয়াছেন, মরা ধনের শবসাধনাকে প্রাণের ও গানের উচ্ছল প্রবাহে ভাসাইয়া দিয়াছেন—মৃত্যু দিয়া আনন্দের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

দরিদ্র-রুধির-পুষ্ট পাশ্চাত্য সভ্যতার হৃদয়হীনতা শেষ পর্য্যন্ত কখনও জয়ী হতে পারে না—কারণ, "স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে।" যাত্রাসুরকে একদিন অভিজিতের হস্তে মরিতেই হইবে; মুক্তধারার বাঁধ একদিন ভাঙিবেই ভাঙিবে; যন্ত্ররাজ বিভূতির ঔদ্ধত্য যদি শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হয় তবে চন্দ্রসূর্য্য মিথ্যা হইয়া যায়। কবি তাই বলিতেছেন,—

একের স্পর্দ্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান।
স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভক্ষুধানল
তত তার বেড়ে ওঠে,—বিশ্ব ধরাতল

আপনার খাদ্য বলি' না করি' বিচার
জঠরে পুরিতে চায়! বীভৎস আহার
বীভৎস ক্ষুধারে করে নির্দ্দয় নিলাজ।
তখন গর্জ্জিয়া নামে তব রুদ্রবাজ।
ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি' স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্ব্বতের পানে।*

এই সভ্যতার প্রতিষ্ঠা স্বার্থের উপর এবং স্বার্থের দ্বারাই ইহা পরিচালিত ও পরিপুষ্ঠ। স্বার্থকে আশ্রয় করিয়া ক্রমে দেখা দেয় লোভ, বিদ্বেষ, কপটতা, সন্দেহ ও উৎপীড়ন। ইহারা দানবের মত; ইহাদের আয়তন ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে। অবশেষে পাপের পরিমাণ এমনই অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যায় যে উহা আপনার ভার আর আপনি বইতে পারে না। তাহার পর একদিন অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী বাজিয়া উঠে, দানব মৃত্যু-যাতনায় অনল উগ্দীরণ করিতে থাকে; কামানের গর্জ্জনে-উহার বিকট আর্ত্তনাদ শুনিতে পাওয়া যায়; পরিশেষে যন্ত্রাসুরের লোহার কদর্য্য বিপুল দেহ অকস্মাৎ একদিন ভাঙিয়া পড়ে। বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে এই ভাঙনের পালা আরম্ভ হইয়াছে। গত মহাযুদ্ধ তাহারই আভাস দিয়াছে।

"অতিশয় শক্তি অতিশয় অশক্তির বিরুদ্ধে চিরদিন নিজেকে বাড়িয়ে চ'লতেই পারে না। ক্ষমতাশালী যদি আপন শক্তিমদে উন্মত্ত হ'য়ে না থাকতো তা হ'লে সব চেয়ে ভয় ক'রতো এই অসাম্যের বাড়াবাড়িকে, কারণ অসামঞ্জস্য মাত্রই বিশ্ববিধির বিরুদ্ধে।"†

যে সভ্যতার চাকচিক্যে অন্ধ হইয়া আমরা নিজের দেশের আদর্শকে শ্রদ্ধা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি সেই সভ্যতা আমাদিগকে যে মুক্তি দান করিবে না—কবি সেই সম্বন্ধে আমাদিগকে বার বার সচেতন করিয়াছেন।

* স্বদেশ।

† রাশিয়ার চিঠি।

জাগিয়া উঠিবে প্রাচী যে অরুণালোকে
সে কিরণ নাই আজি নিশীথের চোখে।*

বাস্তবিকপক্ষে পাশ্চাত্য সভ্যতা হৃদয় অথবা বুদ্ধির দিক দিয়া যে আমাদিগের সভ্যতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একথা পশ্চিমের মনীষীরাও স্বীকার করেন না। আমাদের বারুদ নাই, তাহাদের বারুদ আছে। আমাদের অপেক্ষা তাহাদের অস্ত্র শস্ত্র বেশী, মানুষ মারিবার ক্ষমতা অধিক—এইখানেই আমরা পাশ্চাত্যের কাছে পরাজিত হইয়াছি।

What stands in the way of the freedom of Asiatic populations is not their lack of intelligence, but only their lack of military prowess, which makes them an easy prey to our lust for dominion.†

মাথা নত করা যায় তাহারই চরণে—চরিত্রের দিক দিয়া, চিন্তাশীলতার দিক দিয়া, মনুষ্যত্বের দিক দিয়া যে বড়। কেবলমাত্র গায়ের জোরে এবং ঐশ্চর্যে যে বড় তাহার কাছে মাথা নত করা মনুষ্যত্বের অপমান।

কোরো না কোরো না লজ্জা, হে ভারতবর্ষ
শক্তি-মদমত্ত ওই বণিক-বিলাসী
ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষসম্মুখে।
শুভ্র উত্তরীয় পরি শান্ত সৌম্য মুখে
সরল জীবনখানি করিতে বহন।
শুনো না কি বলে তা'রা, তব শ্রেষ্ঠ ধন
থাকুক হৃদয়ে তব, থাক্ তাহা ঘরে,
থাক্ তাহা সুপ্রসন্ন ললাটের পরে
অদৃশ্য মুকুট তব। দেখিতে যা' বড়,
চক্ষে যাহা স্তূপাকার হইয়াছে জড়,

* স্বদেশ।

† Bertrand Russell.

তা'রি কাছে অভিভূত হ'য়ে বারে বারে
লুটায়ো না আপনায়! স্বাধীন আত্মারে।
দারিদ্র্যের সিংহাসনে কর প্রতিষ্ঠিত,
রিক্ততার অবকাশে পূর্ণ করি চিত!*

বাহির হইতে আমরা দরিদ্র হই—তাহাতে তত ক্ষতি নাই; অন্তরের সম্পদ যদি হারাইয়া ফেলি তবেই সমূহ ক্ষতি। সেই সম্পদ আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি—মনুষ্যত্বের দিক দিয়া আমরা নামিয়া গিয়াছি, আত্মার সম্পদরাশি হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি; যেখানে চিত্ত ছিল সেখানে দ্রব্যরাশি আনিয়াছি; যেখানে তৃপ্তি ছিল সেখানে আড়ম্বরকে স্থান দিয়াছি; যেখানে শান্তি ছিল সেখানে স্বার্থের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। এইখানেই আমাদের প্রকৃত মৃত্যু আরম্ভ হইয়াছে। কবি এই মৃত্যু হইতে তাঁহার জাতিকে বাঁচাইতে চাহিয়াছেন।

আজি সভ্যতার
অন্তহীন আড়ম্বরে, উচ্চ আস্ফালনে,
দরিদ্র-রুধির পুষ্ট বিলাস- লালনে,
অগণ্য চক্রের গর্জ্জে মুখর ঘর্ঘর
লৌহবাহু দানবের ভীষণ বর্ব্বর
রুদ্ররক্ত-অগ্নি-দীপ্ত পরম স্পর্দ্ধায়
নিঃসঙ্কোচে শান্তচিত্তে কে ধরিবে, হায়,
নীরব-গৌরব সেই সৌম্য দীনবেশ
সুবিরল—নাহি যাহে চিন্তাচেষ্টালেশ!
কে রাখিবে ভরি' নিজ অন্তর আগার
আত্মার সম্পদরাশি মঙ্গল উদার!

আমরা পশ্চিমের দিকে মুখ ফিরাইয়া অন্ধভাবে মৃত্যুর পশ্চাতে ছুটিতেছিলাম—কবি আমাদের বহির্মুখী মনকে অন্তরের দিকে, ঘরের দিকে ফিরাইয়াছেন। আমরা স্বদেশকে শ্রদ্ধা করিতে ভুলিয়া

* স্বদেশ।

গিয়াছিলাম বিদেশের প্রতি প্রীতির আতিশয্যে; কবি আমাদের অন্তরে দেশাত্মবোধের নির্ম্মল উৎস খুলিয়া দিয়াছেন।

আমরা আজ যাহাকে অবজ্ঞা করিয়া চাহিয়া দেখিতেছি না—জানিতে পারিতেছি না, ইংরাজি স্কুলের বাতায়নে বসিয়া যাহার সজ্জাহীন আভাসমাত্র চোখে পড়িতেই আমরা লাল হইয়া মুখ ফিরাইতেছি, তাহাই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ, তাহা আমাদের বাগ্মীদের বিলাতী পটতালে সভায় সভায় নৃত্য করিয়া বেড়ায় না, তাহা আমাদের নদীতীরে রুদ্ররৌদ্র বিকীর্ণ, বিস্তীর্ণ, ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীন বস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে। তাহা বলিষ্ঠ ভীষণ, তাহা দারুণ সহিষ্ণু উপবাস ব্রত-ধারী—তাহার কৃষ্ণপঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত, অশোক, অভয় হোমাগ্নি এখনও জ্বলিতেছে। আর আজিকার দিনের বহু আড়ম্বর, আস্ফালন, করতালী, মিথ্যাবাক্য যাহা আমাদের স্বরচিত, যাহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা একমাত্র সত্য, একমাত্র বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছি, যাহা মুখর, যাহা চঞ্চল, যাহা উদ্বেলিত পশ্চিম সমুদ্রের উদ্গীর্ণ ফেণরাশি—তাহা, যদি কখনো ঝড় আসে, দশদিকে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তখন দেখিব, ঐ অবিচলিতশক্তি সন্ন্যাসীর দীপ্তচক্ষু দুর্য্যোগের মধ্যে জ্বলিতেছে, তাহার পিঙ্গল জটাজুট ঝঞ্ঝার মধ্যে কম্পিত হইতেছে,—যখন ঝড়ের গর্জ্জনে অতি বিশুদ্ধ উচ্চারণের ইংরাজী বক্তৃতা আর শুনা যাইবে না, তখন ঐ সন্ন্যাসীর কঠিন দক্ষিণ বাহুর লৌহবলয়ের সঙ্গে তাহার লৌহদণ্ডের ঘর্ষণ-ঝঙ্কার সমস্ত মেঘমন্দ্রের উপরে শব্দিত হইয়া উঠিবে। এই সঙ্গীহীন নিভৃতবাসী ভারতবর্ষকে আমরা জানিব, যাহা স্তব্ধ তাহাকে উপেক্ষা করিব না, যাহা মৌন তাহাকে অবিশ্বাস করিব না, যাহা বিদেশের বিপুল বিলাস সামগ্রীকে ভ্রূক্ষেপের দ্বারা অবজ্ঞা করে, তাহাকে দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিব না; করযোড়ে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিব, এবং নিঃশব্দে তাহার পদধূলি মাথায় তুলিয়া স্তব্ধভাবে গৃহে আসিয়া চিন্তা করিব।*

* স্বদেশ।

পাশ্চাত্যের যে স্বার্থপরতা মারীর মতন দেখিতে দেখিতে সমস্ত ভুবন ঘিরিয়া ফেলিতেছে, যাহার স্পর্শ-বিষ শান্তিময় পল্লীগুলিকে ছারখার করিতেছে, যাহা মানুষকে হীনতার পঙ্কে ডুবাইতেছে, আমাদিগকে তপোবনের বাণী ভুলাইতেছে, কবি সেই স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে মূর্ত্তিমান বিদ্রোহ। এই সর্ব্বনেশে সভ্যতার চরণে ভারতবর্ষ যে নিজের মহিমা ভুলিয়া আপনাকে নির্লজ্জভাবে বিকাইয়া দিতেছে এই দুঃখ কবির চিত্তে অত্যন্ত কঠিনভাবে বাজিয়াছে।

শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন
দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন।
দেশ হ'তে দেশান্তরে স্পর্শ-বিষ তা'র
শান্তিময় পল্লী যত করে ছারখার।
যে প্রশান্ত সরলতা জ্ঞানে সমুজ্জ্বল,
স্নেহে যাহা রসসিক্ত, সন্তোষে শীতল,
ছিল তাহা ভারতের তপোবন তলে;
বস্তুভারহীন মন সর্ব জলে স্থলে
পরিব্যাপ্ত করি দিত উদার কল্যাণ,
জড়ে জীবে সর্ব্বভূতে অবারিত ধ্যান
পশিত আত্মীয় রূপে! আজি তাহা নাশি,
চিত্ত যেথা ছিল সেথা এল দ্রব্য রাশি,
তৃপ্তি যেথা ছিল সেথা এল আড়ম্বর,
শান্তি যেথা ছিল সেথা স্বার্থের সমর!*

এই সভ্যতার মধ্যে আমাদের মুক্তি নাই। আমাদের জ্যোতির্ম্ময় প্রভাত দূরে অপেক্ষা করিতেছে। কবি সেই প্রভাতের জন্য আমাদিগকে জাগিতে বলিয়াছেন।

সে পরম পরিপূর্ণ প্রভাতের লাগি'
হে ভারত, সর্ব্ব দুঃখে রহ তুমি জাগি'

* স্বদেশ।

সরল নির্ম্মল চিত্ত ; সকল বন্ধনে
আত্মারে স্বাধীন রাখি, পুষ্প ও চন্দনে
আপনার অন্তরের মাহাত্ম্যমন্দির
সজ্জিত সুগন্ধি করি', দুঃখনম্র শির
তাঁর পদতলে নিত্য রাখিয়া নীরবে !
তাঁ-হ'তে বঞ্চিত করে তোমারে এ ভবে
এমন কেহই নাই—সেই গর্ব্বভরে
সর্ব্ব ভয়ে থাক তুমি নির্ভয় অন্তরে
তাঁর হস্ত হ'তে ল'য়ে অক্ষয় সম্মান।
ধরার হোক্ না তব যত নিম্ন স্থান
তাঁর পাদপীঠ কর সে আসন তব
যাঁর পদরেণুকণা এ নিখিল ভব।*

পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের যে দিকটা লইয়া আমরা এতক্ষণ আলোচনা করিয়াছি তাহা বিদ্রোহের দিক। কিন্তু ইহা হইতে আমরা যেন এই ধারণা না করি, কবি পশ্চিমের সব কিছুই বর্জ্জন করিতে চাহিয়াছেন। পশ্চিমের সভ্যতার মধ্যে সত্য যেখানে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে কবি সেখানে আমাদের চিত্তকে উন্মুক্ত রাখিতে বলিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে দুয়ার বন্ধ করিতে বলিয়াছেন সেখানেই যেখানে পশ্চিম শক্তি সাধনাকেই একান্ত বড় করিয়া দেখিয়াছে—প্রেমের সাধনাকে দুর্ব্বলতা বলিয়া উপহাস করিয়াছে। প্রতীচি যেখানে উদ্ধত, স্বার্থপর, অর্থ-লালসায় অন্ধ, কবি সেখানে উহাকে এক নিমিষের জন্যও ক্ষমা করেন নাই। ভারতবর্ষের নিজস্ব একটা সাধনা, প্রেমেরও সরলতার সাধনা, সত্যের সাধনা, কল্যানের সাধনা। কবির ভয়, পাছে তাঁহার স্বদেশ নিজের সাধনার বৈশিষ্ট্য ভুলিয়া অন্ধভাবে পশ্চিমের অনুকরণ করে, কারণ তাহা হইলে ধ্বংস অনিবার্য্য !

* স্বদেশ।

We, in India must make up our minds that we cannot borrow other people's history, and that if we stifle our own we are comming suicide. when you boorow things that do not belong to your life, they only serve to crush your life.*

পশ্চিম যেখানে কলকারখানা গড়িয়াছে এবং কামান পাতিয়াছে সেখানে যেন আমরা মস্তক অবনত না করি—কারন যেখানে ভয়ে অথবা বাহিরের ঐশ্বর্যে অভিভূত হইয়া আমরা শির নত করি সেখানে আমরা নিজেকেই অপমান করিয়া থাকি। কি অপূর্ব্ব ভাষায় কবি তাঁহার স্বদেশকে দুঃখ ও অপমানের মধ্যে নির্ভীক, অচঞ্চলচিত্তে আপনার সাধনায় ব্রতী থাকিতে বলিয়াছেন! অবসাদ ও দৈন্যের অন্ধকারে যিনি স্বদেশের কর্ণে এত বড় আশার গান শুনাইতে পারেন তিনি জাতির প্রণম্য। কবির সেই অপূর্ব্ব ভাষা এখানে উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই অধ্যায়ের উপসংহার করিলাম।

দেবই হউন আর মানবই হউন' লাটই হউন আর জ্যাকই হউন, যেখানে কেবল প্রতাপের প্রকাশ, বলের বাহুল্য সেখানে ভীত হওয়া, নত হওয়ার মত আত্মাবমাননা, অন্তর্যামী ঈশ্বরের অবমাননা, আর নাই। হে ভারতবর্ষ' সেখানে তুমি তোমার চিরদিনের উদার অভয় ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্যে এই সমস্ত লাঞ্ছনার উর্দ্ধে তোমার মস্তককে অবিচলিত রাখ—এই সমস্ত বড় বড় নাম-ধারী মিথ্যাকে তোমার সর্ব্বান্তঃকরণের দ্বারা অস্বীকার কর; ইহারা যেন বিভীষিকার মুখস পরিয়া তোমার অন্তরাত্মাকে লেশমাত্র সঙ্কুচিত করিতে না পারে। তোমার আত্মার দিব্যতা, উজ্জ্বলতা, পরমশক্তিমত্তার কাছে এই সমস্ত তর্জ্জন-গর্জ্জন, এই সমস্ত উচ্চ-পদের অভিমান, এই সমস্ত শাসন শোষণের আয়োজন আড়ম্বর, তুচ্ছ ছেলেখেলামাত্র—ইহারা যদিবা তোমাকে পীড়া দেয়, তোমাকে যেন ক্ষুদ্র করিতে না পারে। যেখানে প্রেমের সম্বন্ধ

* "Nationalism."

সেইখানেই নত হওয়ার গৌরব—যেখানে সে সম্বন্ধ নাই সেখানে যাহাই ঘটুক অন্তঃকরণকে মুক্ত রাখিও, ঋজু রাখিও, দীনতা স্বীকার করিও না, ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিও, নিজের প্রতি অক্ষুণ্ণ আস্থা রাখিও। কারণ নিশ্চই জগতে তোমার একান্ত প্রয়োজন আছে—সেইজন্য বহু দুঃখেও তুমি বিনাশ প্রাপ্ত হও নাই। অন্যের বাহ্য অনুকরণের চেষ্টা করিয়া তুমি যে এতকাল পরে একটা ঐতিহাসিক প্রহসন রচনা করিবার জন্য এতদিন বাঁচিয়া আছ তাহা কখনই নহে। তুমি যাহা হইবে অন্যদেশের ইতিহাসে তাহার নমুনা নাই—তোমার যথাস্থানে তুমি বিশ্ব-ভুবনের সকলের চেয়ে মহৎ। হে আমার স্বদেশ, মহাপর্ব্বত-মালার পাদমূলে মহাসমুদ্রবেষ্টিত তোমার আসন বিস্তীর্ণ রহিয়াছে —এই আসনের সম্মুখে হিন্দু, মুসলমান; খৃষ্টান' বৌদ্ধ বিধাতার আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া বহুদিন হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে; তোমার এই আসন তুমি যখন পুনর্ব্বার একদিন গ্রহন করিবে তখন আমি নিশ্চয়ই জানি—তোমার মন্ত্রের কি জ্ঞানের, কি কর্ম্মের, কি ধর্ম্মের অনেক বিরোধ মীমাংসা হইয়া যাইবে এবং তোমার চরণপ্রান্তে আধুনিক নিষ্ঠুর পোলিটিক্যাল কালভুজঙ্গের বিশ্বদ্বেষী বিষাক্ত দর্প পরিশ্রান্ত হইবে। তুমি চঞ্চল হইও না, লুব্ধ হইও না, ভীত হইও না, তুমি "আত্মানং বিদ্ধি" আপনাকে জান এবং "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্যবরান নিবোধত, ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" উঠ' জাগো, যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাই পাইয়া প্রবুদ্ধ হও' যাহা যথার্থ পথ তাহা ক্ষুর-ধার-শাণিত দুর্গম দুর-ত্যয়—কবিরা এইরূপ বলিয়া থাকেন।*

* রাজা-প্রজা।

রবীন্দ্রনাথের বাণী—প্রাণের বাণী।

জয়ী প্রাণ, চিরপ্রাণ,
জয়ীরে আনন্দগান
জয়ী প্রেম, জয়া ক্ষেম,
জয়ী জ্যোতীর্ম্ময় রে।

যে প্রাণ অপর্য্যাপ্ত, যে প্রাণ কিছুতেই মরিতে চাহে না, যাহা মন্ত্রের অপেক্ষা সত্য, হাজার বছরের অতি প্রাচীন আচারের অপেক্ষা সত্য, সেই প্রাণের জয়গান কবির কাব্য হইতে নব নব ছন্দে উৎসারিত হইয়াছে। 'ফাল্গুনী'র কবিশেখর যৌবনের কানে যে মন্ত্র দিয়া বেড়ান তাহা প্রাণেরই মন্ত্র! "আমাদের মন্ত্র এই যে, ওরে ভাই, ঘরের কোণে তোদের থলি থালি আঁক্‌ড়ে বসে' থাকিস্‌নে—বেরিয়ে পড়্‌, প্রাণের সদর রাস্তায়, ওরে যৌবনের বৈরাগীর দল।"

আয়রে তবে, মাতরে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে!
পিছন পানের বাঁধন হ'তে
চল্‌ ছুটে আজ বন্যাস্রোতে,
আপনাকে আজ দখিন হাওয়ায়
ছড়িয়ে দেরে দিগন্তে,
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।*

* ফাল্গুনী।

বসন্তোৎসবে ইহাই কবির প্রাণের গান।

Whoever you are come forth! or man or woman come forth!

You must not stay sleeping and dalling there in the house, though you built it, or though it has been built for you.*

এই যে চলার মন্ত্র -- এই মন্ত্রই অমৃতের মন্ত্র। এই অমৃতের মন্ত্র বিলাইয়া যুগে যুগে যাহারা মানুষের কান্না থামাইয়াছে, মানুষের ইতিহাসকে নূতন করিয়া গড়িয়াছে তাহারা কা'রা? কবির ভাষাতেই বলি,

যারা বৈরাগ্যবারিধির তলায় ডুব মেরেচে তা'রা নয়, যারা বিষয়কে আঁকড়ে ধরে, রয়েচে ত'ারা নয়, যারা কাজের কৌশলে হাত পাকিয়েছে তারাও নয়, যারা কর্ত্তব্যের শুষ্ক রুদ্রাক্ষের মালা জপ্‌চে তা'রাও নয়, যারা অপর্য্যাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে পেয়েচে ব'লেই জগতের কিছুতে যাদের উপেক্ষা নেই, জয় করে তারা, ত্যাগ করেও তা'রাই, বাঁচতে জানে তা'রা, মরতেও জানে তা'রা, তা'রা জোরের সঙ্গে দুঃখ পায়, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ দূর করে,--সৃষ্টি করে তা'রাই, কেন না তাদের মন্ত্র আনন্দের মন্ত্র, সব চেয়ে বড় বৈরাগ্যের মন্ত্র!†

এই প্রাণ যাহার মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে সে তো আপনাকে গণ্ডীর মধ্যে সঙ্কীর্ণ বিধি নিষেধের ডোরে বাঁধিয়া রাখিবে না—সে আপনাকে দিকে দিকে বিলাইয়া দিবে নদী যেমন করিয়া আপনাকে বিলাইয়া দেয়, ফুল যেমন করিয়া আপনার গন্ধ বিতরণ করে। সে বলে,

I will scatter myself among men and women as I go, I will toss a new gladness and roughness among them."

বিশ্বের বাঁশীতে নাচের যে ছন্দ বাজে—তাহার মধ্যে সেই ছন্দ।

* Whitman: "Song of the Open Road „

†

যে ছন্দে গ্রহনক্ষত্রের দল ভিখারী নট-বালকের মত আকাশে আকাশে নাচিয়া বেড়ায় সেই ছন্দে সেও নাচিতে নাচিতে পৃথিবীর বুক দিয়া চলিয়া যায়। তাহার কাছে জগতের সব কিছুই সুন্দর—যাহার দিকে সে দৃষ্টিপাত করে তাহারই প্রাণ খুসীতে ভরিয়া উঠে। তাহার কাছে পর নাই, সব ভাই; দূর নাই, সব নিকট। সে বলে,

> I inhale great draughts of space,
> The east and the west are mine, and the north and the south are mine.*

এই যে আপনাকে দিকে দিকে দেশে দেশে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া, সমস্ত বিশ্বের নাড়ীর স্পন্দনকে নিজের মধ্যে অনুভব করা, ইহাই তো ধর্ম্মের প্রাণ—ইহারই নাম তো বাঁচা। আর যা কিছু তাহাকে বাঁচা বলে না, তাহাকে বলে টি`কিয়া থাকা। টি`কিয়া থাকা ও বাঁচার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। আকাশের মধ্যে পাখা মেলিয়া পাখী বাঁচে, পাথরের কোটরের মধ্যে ব্যাঙ টি`কিয়া থাকে! যাহারা বাঁচে কেবলমাত্র টি`কিয়া থাকে না, তাহাদের মন্ত্র—আনন্দের মন্ত্র, মুক্তির মন্ত্র, শক্তির মন্ত্র, প্রেমের মন্ত্র, প্রাণের মন্ত্র।

মানুষের এই বাঁচার পথে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল অন্তরায় হইয়া আছে অতীতের শৃঙ্খল, আচারের আবর্জ্জনা, অভ্যাসের অত্যাচার, পুঁথির বুলির শাসন। মানুষের মধ্যে প্রাণের উৎস যেখানে শুকাইয়া আসে পুঁথির পরিমাণ সেখানে বাড়িয়াই চলে। মানুষ সেখানে কেবল বিধি নিষেধের পর বিধি নিষেধের প্রাকার গড়িয়া তুলে এবং আপনাকে 'অচলায়তনে'র মধ্যে বন্দী করে। সেখানে হাজার বছরের নিষ্ঠুর বাহু মনকে পাথরের মুঠায় চাপিয়া ধরে; উত্তর দিকে জানালা খুলিয়া সেখানে বাহিরের পানে চাহিলে ছয় মাস মহাতামস সাধন করিতে হয়—কারণ বাহিরের হাওয়া আয়তনের মন্ত্রঃপূত রুদ্ধ বাতাসকে আক্রমণ করিলে যে অশুচি হইবার আশঙ্কা আছে! রবীন্দ্রনাথের

* Whitman.

বিদ্রোহ এই অচলায়তনের বিরুদ্ধে যেখানে পূজা অর্চ্চনা পুরুত পাণ্ডা দিনক্ষণ ভাগা তাবিজে বুদ্ধিশুদ্ধি চাপা পড়িয়া যায়, যেখানে 'মনের পক্ষে প্রাচীন হ'য়ে উঠ্‌তে বয়সের দরকার হয় না।' "Morality can destroy a soul quite as easily as immorality." হৃদয়ের মধ্যে যদি প্রেম না থাকে, শুধু যদি কর্ত্তব্যকে ভালবাসি, প্রাণকে না ভালবাসি, ভগবানের সঙ্গে তাহা হইলে মিলনের পথ খোলা রহিল কোন খানে? ধর্ম্ম কি কেবল পুঁথির মন্ত্রে? দেবতা কি কেবল মন্দির প্রাঙ্গনে?

যাহা অধিকাংশ লোক বলে, যাহা কেতাবে লেখা আছে তাহাকে যখন মানুষ আপনার বিচারবুদ্ধির উপরে স্থান দান করে তখন সে হইয়া যায় যন্ত্রের সামিল। অধিকাংশ মানুষ আজীবন যন্ত্র হইয়াই থাকিতে চায়—কারণ যেমন করিয়াই হউক শান্তি তাহাদের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা কাম্য বস্তু। পুরাতনকে ছাড়িয়া নূতনের মধ্যে যাওয়ার পথে ভাবনা অনেক—তাহাতে মনের বিক্ষেপ ঘটে, শান্তি চলিয়া যায়।

> খাঁচায় যে পাখীটার জন্ম যে আকাশকেই সব চেয়ে ডরায়, সে লোহার শলাগুলোর মধ্যে দুঃখ পায় তবু দরজাটা খুলে দিলে তার বুক দুর দুর করে, ভাবে, বন্ধ না থাকলে বাঁচব কি করে? আপনাকে যে নির্ভয়ে ছেড়ে দিতে শিখিনি। এইটেই আমাদর চির কালের অভ্যাস।*

পিছনের কোন বালাই নাই। সেখানে আঘাত নাই, বিপদ নাই, মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব নাই, বাহিরের সঙ্গে বিরোধ নাই, সেখানে সমস্তই জানা, সমস্তই অভ্যস্ত, সমস্তই নিয়মে বাঁধা; সেখানে সকল প্রশ্নের উত্তর শাস্ত্রের ভিতর হইতেই পাওয়া যায়—নূতন করিয়া কিছু ভাবিতে হয় না। সেখানে মানুষ বলে, 'গুরু, তুমি যখন আস্‌বে, কিছু সরিও না, কিছু আঘাত কোরো না—চারিদিকেই আমাদের শান্তি, সেই বুঝে পা ফেলো। দয়া কোরো, আমাদের! আমাদের পা আড়ষ্ট হ'য়ে গেছে,

* অচলায়তন।

আর আমাদের চলবার শক্তি নেই। অনেক বৎসর অনেক যুগ যে এম্‌নি ক'রেই কেটে গেল—প্রাচীন, প্রাচীন, সমস্ত প্রাচীন হয়ে গেছে—আজ হঠাৎ বোলো না যে নূতনকে চাই—আমাদের আর সময় নেই।' *

এই নির্জীব শান্তিলাভের কামনায় মানুষ যেখানে শাস্ত্রকারাগারে জ্ঞানকে বধ করিয়াছে, আচারের মরুবালুরাশির মাঝে বিচারের স্রোতঃপথকে লুপ্ত হইতে দিয়াছে, সনাতন ধর্ম্মবিধিকে মানুষের প্রাণের অপেক্ষা বড় করিয়া দেখিয়াছে সেখানে কবি সর্ব্বনাশের বাজনা বাজাইয়াছেন—লড়াইয়ের ঝোড়ো হাওয়া আনিয়া অচলায়তনের পাষাণ-প্রাকারকে ধূলার সঙ্গে লুটাইয়া দিয়াছেন। অচলায়তনের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া মানুষের প্রাণকে মুক্তি দিবার জন্য কবি যাঁহাকে আনিয়াছেন সেই দাদাঠাকুরের হাতে শান্তির শুভ্র পতাকা নাই—তাঁহার বেশ যোদ্ধার বেশ। তাঁহার বাণী প্রাণের বাণী—যে প্রাণ জাগিলে মানুষ আপনাকে শাস্ত্রের অর্থহীন অনুশাসনের মাঝে বন্দী করিয়া রাখে না, কেবল আপনাকেই আপনি প্রদক্ষিণ করে না, যে প্রাণ জাগিলে মানুষ নির্ম্মল আকাশ-তলে দাঁড়াইয়া সকল দেশের সকল মানুষকে দু' বাহু মেলিয়া অভ্যর্থনা করে, সকলের সঙ্গে এক হইয়া যায়।

> যে চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোন জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের মধ্যেই ঘুরিয়ে মারে, তার থেকেই বের করে সোজা রাস্তায় বিশ্বের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যেই আমি আজ এসেছি। †

এই বিপুল প্রাণের বাণীই গুরুর বাণী।

অতীতের কঙ্কালকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে তাহারাই যাহারা শান্তি চায়। যাহারা জীবন চায় তাহারা বলে,

* অচলায়তন

† অচলায়তন

আমরা চাইনে আরাম, চাইনে বিরাম,
চাইনে যে ফল, চাইনে রে নাম,
মোরা ওঠা পড়ায় সমান নাচি,
সমান খেলি জিতে হারে—
আমাদের ভয় কাহারে? *

যাহাদের মন্ত্র হইতেছে চলার মন্ত্র—তাহারা কাহাকে ভয় করিবে? বহু যুগের অন্ধকারকে পিছনে ফেলিয়া তাহারা সম্মুখের দিকে কেবল আগাইয়া চলে, তাহাদের কূল নাই, তাহারা অকূলের যাত্রী। তাহারা কাহারও প্রতিধ্বনি নয়, কাহারও ছায়া নয়। তাহারা ভুল করিয়া করিয়া সত্যকে জানে। নিয়মের রাজ্যে তাহারা অনিয়ম আনে—পুঁথির বুলির দেশে তাহারা উল্টা কথা বলে।

ভাল মানুষ নইরে মোরা
ভাল মানুষ নই।
গুণের মধ্যে ঐ আমাদের
গুণের মধ্যে ঐ।
দেশে দেশে নিন্দে রটে,
পদে পদে বিপদ ঘটে,
পুঁথির কথা কইনে মোরা
উল্টো কথা কই। †

বস্তুতঃ যাহারা কাহারও অনুকরণ করে না, নিজের চোখ দিয়া দেখিবার, নিজের হৃদয় দিয়া ভালবাসিবার, নিজের যুক্তি দিয়া বিচার করিবার সাহস ও বীর্য্য যাহাদের আছে, যাহারা কাহারও ছায়া নয়, যাহারা মানুষ, জগৎ তাহাদিগকে কখনই সুনজরে দেখিবে না। "The world hates Individualism." পাড়ার লোকে তাহাদিগকে ত্যাগ করিবে, পণ্ডিত তাহাদিগকে বলিবে অর্ব্বাচীন, ঘরের লোক বলিবে অনাবশ্যক, বাহিরের লোক বলিবে অদ্ভুত।

* ফাল্গুনী।

† ফাল্গুনী।

তবুও মানুষের গৌরব তাহার ব্যক্তিত্বের মহিমায়। প্রাচীন জগতের তোরণ-দ্বারে লেখা ছিল "Know thyself". ভবিষ্যতের যে নূতন পৃথিবী তাহার সিংহদ্বারে লেখা থাকিবে "Be thyself," রবীন্দ্রনাথ তাহাদিগেরই কবি যাহাদিগকে পৃথিবীর কোন কিছুই অভিভূত করিতে পারে না, যাহারা কোন আইন, কোন আচার অথবা কোন মতের ক্রীতদাস নহে; যাহারা নিজের পথ নিজে রচনা করিয়া অজানার দেশে চলে; যাহারা বলে—

চলরে সোজা, ফেলরে বোঝা
রেখে দে তোর রাস্তা খোঁজা,
চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগেছে। *

হয় অবিশ্রাম চল এবং জীবন চর্চ্চা কর, নয় বিশ্রাম কর এবং বিলুপ্ত হও—ইহাই কবির বাণী।

বাংলার যৌবনের কানে বিদ্রোহের বাণী দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। যেখানে পুঁথির শাসন ছিল সেখানে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন প্রাণের রাজত্ব, যেখানে অতীতের মৃত আবর্জ্জনাভার ছিল সেখানে তিনি জাগাইয়াছেন জীবনের চাঞ্চল্য; যেখানে নিশ্চল শান্তি ছিল সেখানে তিনি আনিয়াছেন লড়াইয়ের ঝড়ো হাওয়া; যেখানে বন্ধন ছিল সেখানে তিনি দিয়াছেন মুক্তির বাণী।

আপদ আছে, জানি আঘাত আছে,
তাই জেনে তো বক্ষে পরাণ নাচে,
ঘুচিয়ে দে ভাই পুঁথি-পোড়ার কাছে
পথে চলার বিধি বিধান যাচা।
আয় প্রমুক্ত, আয়রে আমার কাঁচা॥ †

রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে 'নিরাপদের মার' হইতে মুক্তি দিয়াছেন, দূরের পাওনাকে লইয়া আকাঙ্খার যে দুঃখ, যে দুঃখকে ভোলার

† বলাকা।

মত দুঃখ আর নাই, সেই দুঃখ-ধনে তিনি আমাদিগকে ধনী করিয়াছেন। তিনি না আসিলে আমরা পুঁথির বুলির দেশে এতদিন ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন ও নিশ্চিন্ত হইয়া রহিতাম—ভগ্ন পুরীর মধ্যে ধুতি চাদরটী পরিয়া অত্যন্ত মৃদু মন্দভাবে বিচরণ করিতাম, আহারান্তে কিঞ্চিৎ নিদ্রা দিতাম, ছায়ায় বসিয়া তাস পাশা খেলিতাম এবং কোথাও কোন চাঞ্চল্য দেখিলে মাথা নাড়িয়া বলিতাম—সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্।

আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্য রমণী।
পূজা করি' রাখিবে মাথায়, সে-ও আমি
নই, অবহেলা করি' পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সে-ও আমি নই। যদি পার্শ্বে রাখো
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি করো
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী
আমার পাইবে তবে পরিচয়। *

এইবার মেয়েদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা যে ভাবে সাহিত্যের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার কথা এখানে আলোচনা করিব। ইতিপূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি এবং পূর্ব্বের অধ্যায়গুলিতেও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহী কবি। বিদ্রোহী পুরাতনকে ভাঙিয়া নূতনকে সৃষ্টি করিতে চায়। রবীন্দ্রনাথও পুরাতনকে ভাঙিয়া নূতনকে গড়িতে চাহিয়াছেন। এই নূতনের আদর্শ ন্যায় এবং স্বাধীনতার আদর্শ। ধর্ম্ম, রাজনীতি, নরনারীর সম্পর্ক—সকল ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের মধ্য দিয়া যে শঙ্খ বাজাইয়াছেন, তাহা হইতে ন্যায় এবং স্বাধীনতার জয়গানই উৎসারিত হইয়াছে।

* চিত্রাঙ্গদা।

I am the poet of the woman the same as the man,
And I say it is as great to be a woman as to be a man.
And I say there is nothing greater than the mother of men.

এই সাম্যের গান একদিন আমেরিকার মহাকবি হুইট্‌-ম্যানের লেখনীমুখে প্রকাশ পাইয়াছিল। মহাকবি রবীন্দ্রনাথও হুইট্‌ম্যানের মত আমাদের সম্মুখে সে নূতন জগতের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছেন সেখানে নরনারী সমান—সেখানে নারী কোমল কিন্তু বজ্রের অগ্নিশিখার মত তেজস্বিনী।

মেয়েদের সম্বন্ধে পুরুষ এতদিন যে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে তাহাতে অবজ্ঞাই বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—শ্রদ্ধা অল্পই প্রকাশ পাইয়াছে। জীবন-নাট্যে পুরুষ লইয়াছে প্রধান ভূমিকা—নারী তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া আছে অর্থহীন ছায়ার মত। পুরুষ ঠিক করিয়া লইয়াছে নারীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাজ তাহার সেবা করা। এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া সে তাহাকে ঠেলিয়া দিয়াছে অন্তঃপুরের কোণের দিকে। পাছে সে বিদ্রোহী হইয়া উঠে এই কারণে নারীকে সে দেবী বলিয়াছে—কানে কানে অর্দ্ধরাতে তাহাকে অনেক সোহাগ বাণী শুনাইয়াছে—অলঙ্কারে মনের মত করিয়া তাহাকে সাজাইয়াছে—নিজেকে সহকারতরুর সহিত তুলনা করিয়া মাধবী লতার সহিত তাহার উপমা দিয়াছে। এই সব স্তুতিগানের অনেকখানির পিছনে কিন্তু পুরুষের প্রচ্ছন্ন লালসা। শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে লালসা রহিয়াছে বলিয়াই পুরুষ নিজের ব্যভিচারকে উপেক্ষা করিয়াছে—কিন্তু নারীর বিন্দুমাত্র পদস্খলনকে ক্ষমা করে নাই,—তার ললাটে কুলটার কালিমা লেপিয়া গৃহ হইতে তাহাকে বাহির করিয়া দিয়াছে—তাহাকে পতিতার জীবন লইতে বাধ্য করিয়াছে। পুরুষ মুখে বলিয়াছে নারীকে দেবী কিন্তু চাহিয়াছে তাহার দেহ; তাহাকে নিজের সঙ্গে সমান আসন দান করিয়া জীবনের সঙ্গিনী করে নাই, করিয়াছে ভোগের কারাগারে বিলাসের সঙ্গিনী! নারী দেহ দান করিয়াছে নিরুপায় হইয়া। তাহাকে

খাইতে হইবে, ছেলেমেয়েদের খাওয়াইতে হইবে ; তাহার নিজের এবং ছেলেমেয়েদের জন্য আশ্রয় চাই। পুরুষের সাহায্য না লইয়া উপায় নাই; গৃহের বাহিরে অনাহার। বহু নারী যে প্রতিদিনের অত্যাচার এবং অবিচার সহিয়াও সংসার করিয়া যায় তাহা এই কারণেই। অন্যের কাছে বাধ্য হইয়া আপনার আত্ম-সম্মানকে বলি দেওয়া, ইহা নারীকে হীন করে। প্রেমের সর্ব্বোচ্চ মহিমা স্বাধীনতায় এবং পবিত্রতায়। সেই প্রেম যখন স্বার্থের দ্বারা কলুষিত হইয়া পড়ে তখন নারী হারাইয়া ফেলে তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ। রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহ মানুষের এই হীনতা এবং দুর্গতির বিরুদ্ধে।

> The only human relations that have value are those that are rooted in mutual freedom, where there is no domination and no slavery, no tie except affection, no economic or conventional necessity to preserve the external show when the inner life is dead. *

ভিতরে প্রেম নাই অথচ বাহিরে প্রেমের ভান রহিয়াছে—সে সম্পর্কের মুল্য কি ? নারীর যে স্বাভাবিক লজ্জাশীলতা, মাধুর্য্য এবং কোমলতা রহিয়াছে রবীন্দ্রনাথ কোথাও তাহাকে ছোট করিয়া দেখেন নাই। তাঁহার 'শেষের কবিতা'র লাবণ্য উচ্চশিক্ষিতা হইয়াও শুচিতা, সরলতা এবং নারী সুলভ লজ্জাশীলতার মধুর একখানি ছবি ; তাহার মধ্যে কোনখানে কঠোরতা নাই—সে যেটুকু কঠোর হইয়াছে সেও প্রেমেরই জন্য। লাবণ্যের পাশে তিনি ধরিয়াছেন কেটির ছবি—উদ্ধত, অবিনয়ী কেটি—কর্কশ ব্যবহারে তার কোন সঙ্কোচ নেই—মাতার বয়সী যোগমায়ার সম্মুখে সিগারেট টানিতে সে লজ্জাবোধ করে না—তার মুখের স্বাভাবিক গৌরিমা বর্ণ-প্রলেপের দ্বারা এনামেল করা। এক কথায় কেটি বাঙালীর মেয়ে হইয়াও আচারে ব্যবহারে ইংরেজের মেয়ের অনুকরণ করিতে গিয়া এক অদ্ভুত জীবে পরিণত

* Bertrand Russel.

হইয়াছে। সে বিলিতি দোকানের পুতুলের মতো; কৃত্রিম আবহাওয়ায় তাহার হৃদয় শুকাইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই হালফ্যাসনের উদ্ধত মেয়েটীকে ক্ষমা করেন নাই—যে আদর্শে বাঙালীর ঘরের মেয়ে কেতকী মিত্র আপনাকে কেটি মিটারে গড়িয়া তুলিয়াছে সেই ফেরঙ্গ আদর্শকে আঘাত করিয়া কবি ধুলায় লুটাইয়া দিয়াছেন—বেদনা দিয়া কেটির মনে চেতনা জাগাইয়াছেন—চোখের জলে ডুবাইয়া তাহাকে নূতন জীবনের মধ্যে বাঁচাইয়াছেন—যে জীবন সরল, শান্ত, কোমল মধুর, স্নিগ্ধ এবং শুচি।

'যোগাযোগে'র কুমু কোমলতার একখানি প্রতিমূর্ত্তি। বাল্মীকি যেমন করিয়া আপনার অন্তরের স্বপ্নকে সীতা চরিত্রে রূপ দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথও তেমনি অন্তরের সমস্ত দরদ দিয়া কুমুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। নিপুণ শিল্পি তুলির এক একটী টান দিয়াছেন আর সেই টানে কুমুর চরিত্রের বিশেষত্বটুকু উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কুমু বিবাহের পর শ্বশুর বাড়ী চলিয়া যাইবে; বিদায়ের পুর্ব্বে দাদার 'বেসি' ঘোড়াকে গুড়মাখা আটার রুটি খাওয়ানোর ছবি কুমু-চরিত্রের সমস্ত কোমলতাকে কি সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

"হঠাৎ এক সময়ে মনে প'ড়ে গেলো দাদার 'বেসি' ঘোড়াকে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়ে যাবে ব'লে কাল রাত্রে সে গুড়মাখা আটার রুটি তৈরী ক'রে রেখেছিলো। সইস আজ ভোর বেলায় তাকে খিড়কির বাগানে রেখে এসেচে। কুমু সেখানে গিয়ে দেখ্‌লে ঘোড়া আমড়া গাছ তলায় ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে। দূর থেকে কুমুর পায়ের শব্দ শুনেই কান খাড়া ক'রলে এবং তাকে দেখেই চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ ক'রে উঠ্‌লো। বাঁ হাত তা'র কাঁধের উপর রেখে ডান হাতে কুমু তার মুখের কাছে রুটি ধ'রে তাকে খাওয়াতে লাগ্‌লো। সে খেতে খেতে তা'র বড়ো বড়ো কালো স্নিগ্ধ চোখে কুমুর মুখের দিকে কটাক্ষে চাইতে লাগ্‌লো। খাওয়া হ'য়ে গেলে বেসির দুই চোখের মাঝখানকার প্রশস্ত কপালের উপর চুমো খেয়ে কুমু দৌড়ে চ'লে গেলো।"

ছোট একটী ছবি কিন্তু কি মধুর, কি প্রাণস্পর্শী! নারী বলিতে যে করুণার ছবি আমাদের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে, যে আপনাকে সংসারের সর্ব্বত্র অতি সহজভাবে বিলাইয়া দেয়, পশুপক্ষী তরুলতাকেও আপনার হৃদয়ের মধ্যে সযত্নে স্থান দান করে, কুমুকে কবি নারীর সেই স্বভাবসিদ্ধ কোমলতার আদর্শে সৃষ্টি করিয়াছেন। কুমুর আর একটী ছবি। "দেখতে পেলে একটা এক-পা-কাটা কুকুর তিন পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাটি শুঁকে বেড়াচ্ছে। আহা, কিছু খাবার যদি হাতের কাছে থাক্‌তো! কিছুই ছিলোনা। কুমু মনে মনে ভাবতে লাগ্‌লো, যে-একটি পা গিয়েচে তারি অভাবে ওর যা কিছু সহজ ছিলো তা'র সমস্তই হ'য়ে গেলো কঠিন।" ইহার পরেই আছে সেই ছবিখানি যেখানে পুঁতিগাঁথা থলে উজাড় করিয়া কুমু দুর্ভাগা চাষীর মেয়েটীকে দশ টাকা দিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিল। কুমু করুণার একখানি প্রতিচ্ছবি। এক-পা-কাটা কুকুরের দুঃখও সে নিজের দুঃখ বলিয়া অনুভব করে, সকলের বেদনায় তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। কালিদাসের শকুন্তলা যেমন তপোবনের তরুলতা হইতে আরম্ভ করিয়া হরিণ শিশুটী পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে আপনাকে ছড়াইয়া দিয়াছে—রবীন্দ্রনাথের কুমুও তেমনি দাদার বেসি ঘোড়া এবং প্লাট্‌ফরমের এক-পা-কাটা কুকুর হইতে আরম্ভ করিয়া শ্বশুর বাড়ীর বালক হাব্‌লু পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র আপনাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে—কোনখানে সে আপনাকে স্বার্থের মধ্যে সঙ্কুচিত করে নাই—আপনার সত্তাকে কেবল নিজের সুখদুঃখের কোটরের মধ্যে গুটাইয়া রাখে নাই।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার আর একটী অনুপম সৃষ্টি রাণী সুমিত্রা। সুমিত্রা শুধু রাজবধূ নয়, তিনি লোকমাতা। অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও তাঁর সুখ নাই; নিপীড়িত প্রজার মর্ম্মভেদী কান্নার প্রতিধ্বনি দিনরাত্রি তাঁহার চিত্তকুহরে ক্ষুব্ধ হইয়া বেড়ায়। সুমিত্রা করুণার প্রতিচ্ছবি।

কিন্তু নারীকে লজ্জাশীলতা, ধৈর্য্য, করুণা ও কোমলতা প্রভৃতি গুণে বিভূষিত করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ কোথাও তাহাকে হীন করেন নাই। সকল খাঁটি প্রেমের মধ্যেই খানিকটা আত্মসমর্পণের ভাব আছে। কিন্তু আত্মসমর্পণ যেখানে মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করে, স্বাধীনতাকে পঙ্গু করে, ব্যক্তিত্বের মহিমাকে ম্লান করে সেখানে উহা অলঙ্কার নহে, কলঙ্ক। রবীন্দ্রনাথের কুমু কোমল—কিন্তু তেজস্বিনী। জীবের দুঃখে তাহার হৃদয় গলিয়া যায় কিন্তু তাহার সতেজ চিত্ত ঔদ্ধত্যের কাছে কখনও মাথা নত করে না। কুমুর স্বামী মধুসূদন ভাবিয়াছিল, ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে চাটুয্যেদের বাড়ীর মেয়েকে অভিভূত করিয়া দিবে; সে মনে করিয়াছিল, কুমু সাধারণ মেয়েরই মতো সহজেই শাসনের অধীন, এমন কি শাসনই পছন্দ করে। কিন্তু কুমু সহজেই তাহার সে ভুল ভাঙিয়া দিল। কুমুদিনীর দাদা কুমুকে একটী নীলার আঙটী উপহার দিয়াছিল। মধুসূদন অমঙ্গলের ভয়ে সেই আঙটী যখন জোর করিয়া তাহার হাত হইতে খুলিয়া লইতে চাহিল কুমু তাহাকে দাদার আঙটী স্পর্শ করিতে দিল না—নিজেই তাহা খুলিয়া লইয়া পুঁতির কাজ করা থলেটীর মধ্যে রাখিয়া দিল; মধুসূদনকে দিল না। তাহার পর মধুসূদন একদিন জহরীর নিকট হইতে তিনটী আঙটী লইয়া ভাবিল, কুমুর চিত্ত আঙটী দিয়া জয় করিবে; মনে করিল, চুনি, পান্না এবং হীরার আঙটী দেখিয়া কুমুর লুব্ধ চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। উদাসীন কুমু কিন্তু মধুসূদনের দেওয়া তিনটী আঙটীর একটীও গ্রহণ করিল না; দৃপ্ত অবজ্ঞায় মধুসূদনের সামগ্রী মধুসূদনকেই ফিরাইয়া দিল। প্রেমের কাছে মাথা নত করায় লজ্জা নাই; কিন্তু ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কারের কাছে? না, না,—সেখানে মাথা নত করায় যে অপরিসীম লজ্জা। সেই লজ্জা তেজস্বিনী কুমু কেমন করিয়া বহন করিবে! কুমুর দাদার পত্রখানি মধুসূদন তাহাকে না দিয়া ডেস্কে রাখিয়া দিয়াছিল। মধুসূদনের ভ্রাতার

অপরাধ কুমুকে সে এই পত্রের সংবাদ দিয়াছিল। বাড়ীর কর্ত্তাকে না জানাইয়া এই সংবাদ দেওয়ার অপরাধে যখন নবীনকে সপরিবারে গৃহত্যাগ করিয়া যাইবার আদেশ দেওয়া হইল তখন কুমুও গৃহত্যাগের আয়োজন করিতে লাগিল। মধুসূদন যখন কুমুকে রজবপুরে যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল তখন কুমু শুধু উত্তর দিল "তোমার দেরাজ খোলা নিয়ে ঠাকুরপোদের শাস্তি দিয়েচো। সে শাস্তি আমারই পাওনা।" মধুসূদনকে অবশেষে হার মানিতে হইল। সে ভাবিয়াছিল জবরদস্তি করিয়া কুমুকে জয় করিয়া লইবে; কিন্তু তাহা পারিল না। কুমুকে কঠিনভাবে শাসন করিবার শক্তি মধুসূদন দেখিতে দেখিতে হারাইয়া ফেলিল—তাহার নিজের তরফে যে-সব অসম্পূর্ণতা তাহাই তাহাকে পীড়া দিতে আরম্ভ করিল। মধুসূদন জানিত না নারীর চিত্ত জয়ের কৌশল। যেখানে স্বাধীনতা নাই, যেখানে নারী আপনাকে পুরুষের সমান জ্ঞান করিবার অধিকার লাভ করে নাই, সেখানে প্রেম যে অসম্ভব এই সত্য মধুসূদনের কাছে ধরা দেয় নাই। সে কুমুকে চাহিয়াছিল দাসী হিসাবে, জীবনের সঙ্গিনী হিসাবে চাহে নাই। স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করিবারও যে একটা কলানৈপুণ্য আছে, তা'র মধ্যেও যে পাওয়া বা হারাবার একটা কঠিন সমস্যা থাকিতে পারে একথা মধুসূদনের হিসাবদক্ষ মস্তিষ্কের এককোণেও স্থান পায় নাই। প্রেমের জগতে মধুসূদন একেবারেই শিশু। সে মনে করিয়াছিল, কুমু দৈনিক গার্হস্থ্যের তুচ্ছতায় ছায়াচ্ছন্ন হইয়া প্রাচীরের আড়ালে কর্ত্তাদের কটাক্ষচালিত মেয়েলি জীবন অতিবাহিত করিবে। বিবাহ করিলেই যে মানুষ আপনার হয় না—একথা যদি মধুসূদন বুঝিত! আপনার করিবার উপায় প্রেম, আর প্রেম সত্য সেইখানে যেখানে মুক্তি আছে। মধুসূদনের মধ্যে আছে একটা উদ্দাম লালসা, সে কেবলই কুমুকে মুঠার মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিয়াছে। ভালবাসিয়া, কুমুর কাছে নিজেকে দান করিয়া, কুমুর

স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া, সে যদি ধীরে ধীরে তাহাকে আপনার করিবার চেষ্টা করিত তাহা হইলে কুমুকে সহজেই পাইত। কিন্তু বালক যেমন করিয়া খাঁচার মধ্যে পাখীকে বন্দী করিয়া তাহাকে আপনার করিবার চেষ্টা করে মধুসূদনও তেমনি কুমুকে বন্দিনী করিয়া আপনার করিতে চাহিল, তাহাকে বনের পাখীর মত নির্ভয়ে ছাড়িয়া রাখিতে পারিল না। অধীর আগ্রহে সে কুমুর দেহকে আঁকড়াইয়া ধরিতে গেল; ভাবিল কুমু তাহার দাবী সহজে মানিয়া লইবে। মধুসূদন ঠকিল। ধরিতে গিয়া সে হারাইল—শিশু যেমন করিয়া ফুলকে আঁকড়াইয়া ধরিতে গিয়া তাহার রূপ এবং গন্ধ হারাইয়া ফেলে। একটুখানি দরদ, একটুখানি সংযম, একটুখানি অন্তর্দৃষ্টি যে প্রেমকে চিরদিন অম্লান রাখিতে পারিত, কর্ত্তৃত্বের অভিমান, অসংযম এবং নারী-চরিত্রে অভিজ্ঞতার অভাব সেই প্রেমকে নিমেষে ধূলায় ব্যর্থ করিয়া দিল। দেহের কদর্য্য বাসনার পাহাড়ে ঠেকিয়াই ত' প্রেমের সোনার তরী এমনি করিয়া বানচাল হইয়া যায়!

> So nothing is so much to be dreaded between lovers as just this—the vulgarisation of love—and this is the rock upon which marriage so often splits. *

রাজা বিক্রম যে সুমিত্রাকে হারাইল তাহারও মূলে সংযমের অভাব, প্রবৃত্তির উদ্দামতা, প্রেমের জগতে অভিজ্ঞতার একান্ত অভাব। যখন চারিদিকে সকলেই উৎপীড়নে কাঁদিতেছিল তখন রাজা রাজ-কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়া, প্রজার ক্রন্দন বিস্মৃত হইয়া রাণীর ভালবাসার মধ্যে তৃপ্তি খুঁজিতেছিল। কিন্তু যে প্রেম কর্ত্তব্যকে ভুলিয়া যায়, বৃহৎ জগতকে দূরে পরিহার করিয়া কেবল আলিঙ্গনের আর চুম্বনের মধ্যে সার্থকতা খুঁজিয়া ফিরে, যাহা আপনাকে বিপুল মানবপরিবারের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দেয় না, বিশ্বকে বুকের কাছে টানিয়া আনে না তাহা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

* Edward Carpenter.

It becomes sooner or later retrospective, tomb of dead joys, not a well-spring of new life. The only adequate purposes are those which stretch out into the future, which can never be fully achieved, but are always growing, and infinite with the infinity of human endeavour.*

"যে উন্মত্ত প্রেম প্রিয়জনকে ছাড়া আর সমস্তই বিস্মৃত হয়, তাহা সমস্ত বিশ্ব-নীতিকে আপনার প্রতিকূল করিয়া তোলে সেই জন্যই সে-প্রেম অল্পদিনের মধ্যেই দুর্ভর হইয়া উঠে, সকলের বিরুদ্ধে আপনাকে আপনি সে আর বহন করিয়া উঠিতে পারে না। যে আত্মসংবৃত প্রেম সমস্ত সংসারের অনুকূল, যাহা আপনার চারিদিকেই ছোট এবং বড়ো, আত্মীয় এবং পর কাহাকেও ভোলেনা, যাহা প্রিয়জনকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া বিশ্ব-পরিধির মধ্যে নিজের মঙ্গল-মাধুর্য্য বিকীর্ণ করে, তাহার ধ্রুবত্বে দেবে-মানবে কেহ আঘাত করে না, আঘাত করিলেও সে তাহাতে বিচলিত হয় না। কিন্তু যাহা যতির তপোবনে তপোভঙ্গ রূপে, গৃহীর গৃহ-প্রাঙ্গণে সংসারধর্ম্মের অকস্মাৎ পরাভব রূপে আবির্ভূত হয়, তাহা ঝন্ঝার মতো অন্যকে নষ্ট করে বটে, কিন্তু নিজের বিনাশকেও নিজেই বহন করিয়া আনে।"

নারীর সহজ অনুভূতি দিয়া সুমিত্রা এই কথা বুঝিয়াছিল, কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়নায় অভিভূত হইয়া রাজা এই সত্য বুঝিতে পারে নাই। সেই জন্য নরেশের কাছে ব্যর্থতার ক্রন্দন লইয়া রাজাকে অবশেষে বলিতে হইয়াছে, "নারী যে সুধা এনেছে আমার দীনতম প্রজারও ঘরে, আমি রাজ্যেশ্বর তা'র কণাও পাইনি—আমার দিনরাত্রি তৃষ্ণায় শুকিয়ে গেছে, সুধাসমুদ্রের তীরে ব'সে।" নারীকে যাহারা শুধু ভোগের বস্তু হিসাবে দেখিয়াছে, বিবাহের মধ্যে যাহারা কেবল প্রবৃত্তির উদ্দাম খেলা খুঁজিয়াছে, বিশ্বমাতার মধ্যে প্রেমের পরিসমাপ্তি

* Bertrand R sel

চাহে নাই, তাহাদের জন্য সুমিত্রার মত নারীর সুধা নয়; তাহাদের জন্য তৃষ্ণার দাহ, যে দাহ লইয়া মরুভূমি কাঁদে।

রাজা আর সুমিত্রা। একদিকে উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম কামনার দ্বারা অভিভূত পুরুষ যে নারীকে আপনার ভোগের বস্তু করিয়া রাখিতে চাহে; আর একদিকে শান্ত, সংযত নারী যে রাজহংসীর মতো, রাজার তরঙ্গিত কামনা-সাগরের জলে যাহার পাখা সিক্ত হইতে চাহিল না, রাজ-বৈভবের জালে যে একটুও বাঁধা পড়িল না, যে কল্যাণের প্রতিমূর্ত্তি—যাহার মধ্যে রহিয়াছে নিত্যকালের মায়ের রূপ, যে মা দুঃসহ বেদনার মধ্যে জীবনকে সৃষ্টি করে। রাণী যে রাজাকে ভালোবাসে নাই তাহা নহে কিন্তু সেই ভালোবাসার কাছে রাণী ধর্ম্ম কর্ম্ম শিক্ষা দীক্ষা ভাসাইয়া দিতে পারিল না। সেই ভালোবাসার মধ্যে বিলাসের আবিলতা নাই—তাহা বৃহৎ জগতের দুঃখ এবং প্রজার মঙ্গলকে ক্ষণকালের জন্যও বিস্মৃত হয় নাই। এইখানেই পুরুষ ও নারীর পার্থক্য। পুরুষের মধ্যে রহিয়াছে দ্বন্দ্ব, নারীর মধ্যে আছে সামঞ্জস্য। নারীও ভালবাসে, পুরুষও ভালবাসে—পুরুষ ভালবাসিয়া তৃষ্ণার দাহে পুড়িয়া মরে, চোখের জলে ডুবিয়া যায়, রূপে অন্ধ হইয়া মঙ্গলকে আঘাত করে, আপনাকে বিস্মৃত হয়। নারী ভালবাসে বটে, কিন্তু পুরুষের মত কাঁদিয়া কাটিয়া সে আকুল হয়না, আহত রক্তাক্ত হৃদয়কে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া অস্বাভাবিক কিছু করিয়া বসে না, সে একটি কবিতাও লিখে না; শুধু নিঃশব্দে প্রতিদিনের কাজ করিয়া যায়, তাহার বুক ফাটিয়া যায় কিন্তু মুখ ফুটে না। হৃদয়-জগতে পুরুষ নারীর সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। তাই কি প্রতিশোধ কামনায় দেহের ক্ষেত্রে গায়ের জোরে সে নারীকে তাহার দাসী করিয়া রাখিয়াছে? অথবা প্রতিশোধের কথা তাহার মনেই হয় নাই; দুরন্ত যৌনপ্রবৃত্তিই তাহাকে নারীকে পরাধান করিয়া রাখিবার জন্য প্ররোচিত করিয়াছে।

বলা বাহুল্য, যে মেয়ে তেজস্বিনী সে স্বামীর ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কারকে

কখনও মানিয়া লইবে না ; পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের নামে মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করিবে না। সে ইবসেনের 'নোরা'র মত ব'লবে, সকলের আগে আমি মানুষ—Before all else I am a reasonable human being. যে ধর্ম্ম এতদিন চলিয়া আসিয়াছে তাহাতে আচার, অনুশাসন, শাস্ত্র-বাক্যই নরনারীর সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। যে নূতন ধর্ম্ম আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চলিয়াছে তাহার প্রতিষ্ঠা হইবে স্বাধীনতার উপর, ন্যায়ের উপর, প্রেমের উপর। সেখানে নারী নরের উপর প্রভুত্ব করিবে না—নর নারীকে দাসী করিয়া রাখিবে না।

রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' নারী সম্বন্ধে কবির অন্তরে যে আদর্শ রহিয়াছে সেই আদর্শকে রূপ দিয়াছে। রাণী সুমিত্রা উৎপীড়িত প্রজাদের রক্ষা করিবার জন্য বিক্রমের কাছে প্রার্থনা জানাইলেন, "কাশ্মীর থেকে যে সব লুব্ধের দল তোমার-সঙ্গে জালন্ধরে এসেছে আজই সেই পরোপজীবিদের আদেশ করো কাশ্মীরে ফিরে যেতে।" রাজা উত্তর করিলেন, "দেখো প্রিয়ে, রাজার হৃদয়েই তোমার অধিকার, রাজার কর্ত্তব্যে নয়, সেই কথা মনে রেখো।" সুমিত্রা এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি ত' শুধু রাজ-বধূ নন যে রাজার হৃদয় অধিকার করাই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য ; তিনি যে লোকমাতা। তিনি বলিলেন, "অন্যায়ের হাত থেকে প্রজা রক্ষায় যদি মহিষীর অধিকার আমার না থাকে তবে এ সব তো বন্দিনীর বেশভূষা—এ আমি বইতে পারবো না। মহিষীকে যদি গ্রহণ করো, সেবিকাকেও পাবে, নইলে শুধু দাসী! সে আমি নই।" যে রাজ্যে উৎপীড়নের আর অবিচারের রাজত্ব চলে, যেখানে নিস্পাপ নারী দুর্বৃত্তের হস্তে লাঞ্ছনা ভোগ করে, সে রাজ্যে রাণী হইবার লজ্জা তিনি সহিতে পারিলেন না। তিনি রাজার কাছে নিপীড়িত প্রজাদের জন্য বিচার চাহিলেন ; বলিলেন, "আমার স্থিতি তোমার প্রজাদের কল্যাণলক্ষ্মীর দ্বারে—সেখানকার ধূলির পরেও যদি

আসন দিতে! আমার লজ্জা দূর হোতো। তোমার নিজের তরঙ্গ গর্জ্জনে তোমার কর্ণ বধির, কেমন ক'রে জানবে কী নিদারুণ দুঃখ তোমার চারিদিকে। কত মর্ম্মভেদী কান্নার প্রতিধ্বনি দিনরাত্রি আমার চিত্তকুহরে ক্ষুব্ধ হ'য়ে বেড়াচ্চে তোমাকে তা বোঝাবার আশা ছেড়ে দিয়েচি। যখন চারিদিকে সবাই বঞ্চিত তখন আমাকে তুমি যত বড়ো সম্পদই দাও, তাতে আমার রুচি হয় না।" রাজা রাণীর বিচারের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না, তাঁহাকে উৎসবের বেশ পরিবার আদেশ দিলেন। ইহার পর প্রত্যেক তেজস্বিনী নারীর যাহা কর্ত্তব্য রাণী সুমিত্রা তাহাই করিলেন। স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যের নামে পাপের সঙ্গে আপোষ করিয়া রাজার ভোগের অনলে ইন্ধন যোগাইবার জন্য তিনি জালন্ধরে রহিলেন না। স্বামীর গৃহ রাণী ছাড়িয়া গেলেন মানুষের কর্ত্তব্য পালন করিবার জন্য। ভবিষ্যতে যে নারী আসিতেছে মৃত্যুর জাল ছিন্ন করিয়া নবজীবনের দ্বার উদ্ঘাটিত করিবার জন্য সে হইবে সুমিত্রার মতো, কুমুদিনীর মতো। সে আপনার স্বাভাবিক কোমলতাকে বর্জ্জন করিবেনা, অথচ সঙ্গে সঙ্গে তেজস্বিনী হইবে। সে হইবে সীতার মত মৃদু, দ্রৌপদীর মত নির্ভীক। ইবসেন যখন বলিলেন, জগতের আশা নির্ভর করিতেছে নারী এবং শ্রমিকদের উপর তখন তিনি একটুও অতিরঞ্জিত করিয়া বি বলেন নাই। পুরুষ আসিয়াছে এতদিন যুদ্ধ করিয়া এবং শিকার ক রিয়া, তাহার হাতে বন্দুক, মেসিনগান, তরবারি। নারী নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়া জীবনকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, ভবিষ্যতের বংশধরগণকে বাহু দোলায় দোলাইয়া সে-ই ত' মানুষ করিয়া তুলিতেছে। পুরুষের হাতে মৃত্যুর রূপার কাঠি, নারীর হাতে জীবনের সোনার কাঠি। সোনার কাঠির পরশে যাহারা আশাহীন আলোহীন জীর্ণ জগতকে নূতন করিয়া রচনা করিবে তাহাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন স্বাধীনতার। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ-নারী সেই স্বাধীনতারই পূজারিণী, কিন্তু সেই স্বাধীনতা কোথাও নারী-সুলভ শোভনতা ও সংযমকে আঘাত করেনাই।

সে নম্র অথচ কঠোর, সে স্বাধীন অথচ সকলের পরিচর্য্যায় তাহার কল্যাণ-হস্ত দুইটী রত, সে দৃপ্ত মহিমায় আপনার পায়ে দাঁড়াইয়া আছে কিন্তু তাহার স্বাতন্ত্র্য কাহাকেও উদ্ধতভাবে আঘাত করে না, ভালোবাসায় তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ কিন্তু সেই ভালোবাসায় অন্ধ হইয়া সে কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায় না ; তাহার মধ্যে প্রিয়ের কাছে আপনাকে নিবেদন করিবার ইচ্ছার যে অভাব এমন নহে কিন্তু সেই আত্ম-নিবেদন কখনও দাসীর হীনতায় পর্য্যবসিত হয়না। রবীন্দ্রনাথের নারী ফুলের মত কোমল, অগ্নিশিখার মত তেজস্বিনী ; সে করুণার ছবি অথচ তাহার মধ্যে দৃঢ়তার অভাব নাই ; সে স্বাধীন অথচ সংযমের প্রতিমূর্ত্তি—সে বাচাল না হইয়াও জানে কেমন করিয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় ; ছলনার আশ্রয় না লইয়াও বিজয়িনীর মত আপনার পথ আপনি রচনা করিয়া চলে।

"But we want women, strong of soul, yet lowly
With that rare meekness, born of gentleness ;
Women whose lives are pure and clean and holy,
The women whom all little children bless ;

Brave, earnest women, helpful to each other
With finest scorn for all things low and mean;
Women who hold the names of wife and mother
Far noble than the title of queen."

যাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে ভালো করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, তিনি আমাদের অধিকাংশ দুঃখের মূলে অজ্ঞতাকে আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার মতে মানব সমাজকে নূতন করিয়া গড়িতে হইলে আগে চাই শিক্ষার বিস্তার। মানুষের সকল সমস্যার সমাধানের মূলে হইতেছে তাহার শিক্ষা। আমাদের দেশে তাহার রাস্তা বন্ধ, কারণ আমাদের ভাগ্য যাঁহাদের হাতে তাঁহারা law and orderকেই অত্যুগ্র করিয়া দেখিয়াছেন—ফলে তহবিল একেবারেই ফাঁকা। রুশিয়া যে জাতীয় জীবনে এত শীঘ্র যুগান্তর আনিতে পারিয়াছে তাহার কারণ শিক্ষার বিস্তার। তাহারা বুঝিয়াছে, অশক্তকে শক্তি দিবার একটী মাত্র উপায় শিক্ষা। অন্ন, স্বাস্থ্য, শান্তি সমস্তই নির্ভর করে শিক্ষার উপর।

রবীন্দ্রনাথ রুশিয়ায় গিয়াছিলেন। সেখানকার অবস্থা দেখিয়া তিনি লিখিতেছেন, "বছর দশেক আগেই এরা আমাদের দেশের জনমজুরদের মতোই নিরক্ষর, নিঃসহায়, নিরন্ন ছিল। তাদেরই মতো অন্ধ সংস্কার মূঢ় ধার্ম্মিকতা। দুঃখে বিপদে এরা দেবতার দ্বারে মাথা খুঁড়ছে, পরলোকের ভয়ে পাণ্ডাপুরুতদের হাতে এদের বুদ্ধি ছিল বাঁধা, আর ইহলোকের ভয়ে রাজপুরুষ মহাজন ও জমিদারদের হাতে; যারা এদের জুতো পেটা করতো তাদের সেই জুতো সাফ করা এদের কাজ ছিল।" কয়টী বৎসরের মধ্যে এই মূঢ়তার ও অক্ষমতার পাহাড় নড়াইয়া দিল স্বাধীন, সতেজ চিন্তার বৈদ্যুতিক স্পর্শ।

যে সমাজে আমরা বাস করিতেছি সেই সমাজ যে উৎকট বৈষম্যের উপর দাঁড়াইয়া আছে এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। এই সমাজের আইন কানুন যাহারা গড়িয়াছে তাহারা সকলেই প্রায় ধনীর সন্তান। ধনীরা যে সকল আইন প্রণয়ন করিবে তাহা যে তাহাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাইবে না ইহা নিতান্তই সাধারণ জ্ঞানের কথা। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ নরনারী আজীবন ঘর্মাক্ত কলেবরে পরিশ্রম করিয়া চলিয়াছে; পৃথিবীর সকল সম্পদ তাহারাই সৃষ্টি করিতেছে—অথচ তাহাদের দুঃখের ও দারিদ্র্যের পরিসীমা নাই; আর একদল মানুষ কিছুই করিতেছে না; যেমন করিয়া আমরা মৌমাছিদের লুণ্ঠন করিয়া মধু আহরণ করি তেমনি করিয়া অলস ধনীর দল কোটী কোটী দরিদ্রকে লুণ্ঠন করিয়া বিলাস-সাগরে ভাসিতেছে। দরিদ্র কেন আপনাকে এমন করিয়া লুণ্ঠিত হইতে দিতেছে? অজ্ঞতার জন্য। পুরোহিত শিখাইতেছে, ধন্য তাহারা যাহারা দান, কেননা স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই। অর্থনীতির অধ্যাপক শিখাইতেছে—ধনীরা মূলধন এবং কাজ না দিলে গরীবের বাঁচিবার পথ কোথায়? দরিদ্রের দল পুত্র কন্যার সংখ্যা হ্রাসের দিকে দৃষ্টি রাখিলে তাহারা এত কষ্ট পাইত না। এমনি করিয়া জনসাধারণের মস্তিষ্কে যত ভ্রান্তধারণা সঞ্চারিত করিয়া তাহাদিগকে শান্ত রাখিবার অবিরাম চেষ্টা চলিতেছে। ইস্কুল, পার্লামেণ্ট, সংবাদপত্র সমস্তই ধনীদের দ্বারা পরিচালিত এবং সকলেই একযোগে ষড়যন্ত্র করিয়া জনসাধারণকে চিরপদানত রাখিবার কাজে ব্রতী হইয়াছে। "We are all brought up wrongheaded to keep us willing slaves instead of rebellious ones."

ইস্কুলে কোন শিক্ষক যদি বালক বালিকাগণকে অলস ধনীদের লুণ্ঠনের প্রবৃত্তি সম্বন্ধে সচেতন করিবার চেষ্টা করে, যদি সে প্রচার করে, 'যে সকল লোকের খাটিবার ক্ষমতা আছে অথচ সমাজের সেবা না করিয়া বসিয়া বসিয়া কেবল অন্যের উৎপন্ন দ্রব্য ভোগ করে তাহারা

চোরের সামিল এবং ঘৃণার পাত্র' তবে সেই শিক্ষকের নিতান্তই দুরদৃষ্ট বুঝিতে হইবে; কারণ কর্ত্তৃপক্ষ যে তাহাকে পদত্যাগে বাধ্য করিবে ইহা অনিবার্য্য। যে মিথ্যার জাল সমস্ত সমাজ জীবনকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে—যাহা স্বাধীন মানুষকে পশুর সামিল করিয়াছে সেই মিথ্যার জালকে ছিন্ন করিয়া মানুষকে মুক্ত করিতে পারে একমাত্র জ্ঞানের দিব্য আলোক। রবীন্দ্রনাথ যখন বলিয়াছেন, অশক্তকে শক্তি দিবার একটী মাত্র উপায় শিক্ষা তখন তিনি অতি গভীর সত্যকেই প্রচার করিয়াছেন। সমাজের চির-অন্ধকার তলদেশে উলঙ্গসত্যের আলোকচ্ছটা গিয়া যখন পৌছিবে—জনসাধারণ যখন বুঝিবে তাহাদিগকে মিথ্যার দ্বারা ঠকাইয়া একদল লুণ্ঠন করিয়া খাইতেছে তখন তাহরা নিশ্চয়ই সমাজের শান্ত এবং সুবোধ বালক হইয়া রহিবে না—তাহারা প্রত্যেকে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে—যাহারা পদাতিকের অধম ছিল তাহারা রথী হইবে—যাহারা মেষের মত শান্ত ছিল তাহারা সিংহের মত তেজস্বিতা লাভ করিবে—যে শৃঙ্খল তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে তাহাকে সোহাগ না করিয়া দুই হাতে সবলে তাহারা ছিঁড়িয়া ফেলিবে—ক্রীতদাস মানুষের গরিমা লইয়া বাঁচিবে। রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা', 'রক্ত-করবী' ইত্যাদি নাটকগুলি শৃঙ্খলিত মানুষের এই বাঁধন ছিঁড়িবার প্রচেষ্টাকেই রূপ দিয়াছেন—তাহার মধ্যে নিপীড়িত মানবাত্মার বিদ্রোহের সুর। আমি যখন বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার দিক দিয়া বিদ্রোহ আনিয়াছেন তখন এই কথা বলিবার প্রয়াস পাইয়াছি, তিনি আমাদের চক্ষুর সম্মুখে একটা নূতন জগতের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছেন—আমাদের চিন্তার জগতে তিনি বিপ্লব আনিয়াছেন, সমাজকে যাহারা আইনের আশ্রয়ে লুণ্ঠন করিয়া স্ফীত হইয়া উঠিতেছে, তাহাদের অত্যাচার সম্বন্ধে আমাদের মনকে সচেতন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার 'রাশিয়ার চিঠি' কম সুফল উৎপাদন করে নাই।

৮

রবীন্দ্রনাথের আর একটা বড় দান—বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা জাতির সকল ক্ষেত্রে বিপ্লব আনিয়াছে—গতানুগতিকের অর্থহীন সংস্কারকে আঘাত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে যখন বালক ছিলেন তখন আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর এবং বিদ্যালয়ের আবহাওয়া তাঁহার পক্ষে দুঃসহ ছিল। বিদ্যালয় তাঁহার কাছে জেলখানার মত নীরস লাগিত। কবি বাণীর দুলাল পুত্র সন্দেহ নাই—কিন্তু তিনি যে ইস্কুল-পালানো ছাত্র ইহাতেও সন্দেহ নাই। বিদ্যালয় তাঁহার কাছে আনন্দের স্থান ছিল না—চেয়ার, বেঞ্চি, দেওয়াল, পুঁথি আর পরীক্ষার চিন্তা বিদ্যালয়কে সহজেই ভয়ের স্থান করিয়া তোলে।

রবীন্দ্রনাথ স্থির করিলেন, তিনি শিক্ষার কেন্দ্রকে কেবল জ্ঞানের কেন্দ্র করিয়া তুলিবেন না—উহাকে আনন্দের যজ্ঞ করিয়া তুলিবেন। ছেলে মেয়েরা শিক্ষা লাভ করিবে আনন্দের মধ্য দিয়া। যেখানে তাহারা জ্ঞানের চর্চ্চা করিবে সেখানে আলো থাকিবে, গান থাকিবে, সহজ সুন্দর প্রকৃতির অবাধ আনাগোনা থাকিবে। প্রাচীন ভারতের শিক্ষার আদর্শ এই দিক দিয়া তাঁহার মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বৃক্ষের ছায়ায় প্রভাতের বিহঙ্গ-কাকলির মধ্যে গুরু ছাত্রগণকে জ্ঞান বিতরণ করিতেন—চারিদিকে তপোবনের অপার শান্তি বিরাজ করিত—প্রভাত-রৌদ্র-কিরণে তরুলতা হাসিত। প্রকৃতির মুক্তক্রোড়ে সৌন্দর্য্যের মধ্যে ছাত্রের হৃদয় সহজ আনন্দে, জ্ঞানে,

গুণে উন্নত হইয়া উঠিত। মানুষের হৃদয়ের সহিত প্রকৃতির অবাধ মেলামেশা হইত এবং সেই মেলামেশার ফলে মন সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিত ; সেই সমৃদ্ধিশালী মনে জ্ঞান সহজেই বিকশিত হইত।

আধুনিক বিদ্যালয়গুলি ছাত্রের মনকে অবাধে বিকশিত হইতে দেয় না। সেগুলির মধ্যে উপাদানের বাহুল্য আছে—চেয়ার আছে, বেঞ্চি আছে প্রশস্ত কক্ষ-শ্রেণী আছে—নাই প্রকৃতির সজীব স্পর্শ যাহা বালকের মনকে নূতন রঙে রাঙাইয়া দেয়, নাই মুক্তির আবহাওয়া যাহার মধ্যে চিত্ত অতি সহজে শতদলের মত প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন শিক্ষা-জগতে একটা প্রকাণ্ড বিপ্লব। সেখানে পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করা এবং উপকরণের বাহুল্যকে বড় স্থান দেওয়া হয় নাই—বড় স্থান দেওয়া হইয়াছে বালকের চিত্তকে, যাহার বিকাশ সাধনই শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য। সেখানে আছে মুক্তি—বিস্তীর্ণ প্রান্তরে শ্যামল তরুলতার মধ্যে পুলকিত মানব-মনের মুক্তি। সেখানে নীল আকাশের তলায় আমলকীর কুঞ্জে সরস্বতীর আসন পাতা হইয়াছে। আম্রকুঞ্জের ছায়ায় আসন বিছাইয়া ছাত্র-ছাত্রীগণ অধ্যয়ন করে।

আমরা পূর্ব্বে বিদ্যালয়ের কথা মনে করিলেই সর্ব্বাগ্রে ভাবিতাম চেয়ার, বেঞ্চি, টেবিল অন্যান্য আসবাব-পত্র এবং সাজ-সরঞ্জামের কথা। ব্যয়ের কথা ভাবিয়াই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্প অনেক সময়ে বর্জ্জন করিতে আমরা বাধ্য হইতাম। প্রকাণ্ড ব্যয়ের কথা ভাবিয়াও যদি বা পশ্চাৎপদ না হইলাম শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল, আসবাবপত্র এবং চুন সুড়কির পিছনেই অধিকাংশ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে—অবশিষ্ট টাকা অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। আমরা মনিব্যাগ কিনিতেই টাকা নিঃশেষ করিয়া ফেলিতাম—তাহার মধ্যে রাখিবার মত কিছু অবশিষ্ট থাকিত না।

শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা করিয়া রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা নূতন পথ খুলিয়া দিয়াছেন। সেখানে আসবাবপত্রের বাহুল্য নাই ;

টেবিল চেয়ারের অভাবে শিক্ষার কাজ আটকাইয়া থাকে না—তরুতল অট্টালিকার কাজ করে—শাল-বীথিকায় আসন বিছাইয়া ছাত্রছাত্রীগণ জ্ঞানের চর্চ্চায় রত থাকে। বিদ্যালয় সেখানে ছাত্রের পক্ষে বিভীষিকার স্থান নহে—শিক্ষাদান এবং শিক্ষা গ্রহণ সর্ব্বদাই আনন্দের বিষয়। সেখানে আছে সরলতা, অনাড়ম্বর, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অবাধ মিলন।

> মানুষের পক্ষে অন্নেরও দরকার থালারও দরকার একথা মানি, কিন্তু গরীবের ভাগ্যে অন্ন যেখানে যথেষ্ট মিলিতেছে না সেখানে থালা সম্বন্ধে একটু কষাকষি করাই দরকার। যখন দেখিব, ভারত জুড়িয়া বিদ্যার অন্নসত্র খোলা হইয়াছে তখন অন্নপূর্ণার কাছে সোনার থালা দাবী করিবার দিন আসিবে। আমাদের জীবনযাত্রা গরীবের অথচ আমাদের শিক্ষার বাহ্যাড়ম্বরটা যদি ধনীর চালে হয় তবে টাকা ফুঁকিয়া দিয়া টাকায় থলি তৈরী করার মতো হইবে। *

রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিক্ষা-জগতে আর একটা বিপ্লব আনিয়াছেন ভাষার দিক দিয়া। জার্ম্মানীতে, ফ্রান্সে, আমেরিকায়, জাপানে যে সকল আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় জাগিয়া উঠিয়াছে তাহাদের মূল উদ্দেশ্য সমস্ত দেশের চিত্তকে মানুষ করা। দেশকে তা'রা সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। "দেশের এই মনকে মানুষ করা কোন মতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে। আমরা লাভ করিব অথচ সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবেনা, আমরা চিন্তা করিব কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে, আমাদের মন বাড়িয়া চলিবে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না, সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কি হইতে পারে ?"

উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিষ করিয়া লইতে হইবে—বাংলা ভাষাতেই আমরা উচ্চ শিক্ষা দিব এবং দেওয়া

* পরিচয়।

যায়, এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে—একথা রবীন্দ্রনাথ যত দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন এত দৃঢ়তার সহিত খুব কম বাঙালীই বলিয়াছে। "যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহিতায় শূদ্র? তার কানে উচ্চ শিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরাজী ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবে আমরা দ্বিজ হই?" ইহা রবীন্দ্রনাথেরই ভাষা। তিনি দীনা মাতৃভাষাকে যে গৌরব দান করিয়াছেন—উপেক্ষিতা বাংলা ভাষাকে যে সম্মানের আসনে বসাইয়াছেন—তাহার জন্য বাঙালী চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিবে। সংসারে চলিবার পথে আমরা পিছন মুখে চলিতেছিলাম; বাংলাভাষার মাতৃস্তন্যকে ছোট করিয়া ইংরেজী ভাষার ধাত্রীস্তন্যকে উচ্চতর স্থান দিয়াছিলাম। এই অস্বাভাবিক কৃত্রিম ব্যবস্থার প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহ ঘোষিত হইয়াছে। তিনি দেশের প্রাণ হইতে প্রাণ লইয়া দেশকে প্রাণ দিতে চাহিয়াছেন। আজ দেশের রাষ্ট্রীয় সাধনার পথে চলিবার একান্ত উৎসাহে যেন ভুলিয়া না যাই রবীন্দ্রনাথ কত দিক দিয়া আমাদের চিত্তকে বিপ্লবী করিয়া তুলিয়াছেন; কত নূতন নূতন পথে তাঁহার ক্লান্তিহীন চেষ্টা পরিচালিত হইয়াছে।

চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার ;—
সে ত নহে সুখ, ওরে, সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।
মৃত্যু তোরে দিবে হানা,
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা,
এই তোর নব বৎসরের আশীর্ব্বাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ। *

পরাধীন জাতির কবিকে দুঃখের পূজারী হইতে হইবে। চারিদিকে যেখানে মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের রোল সেখানে আরামের জন্য ব্যাকুল হওয়া নিতান্ত স্বার্থপরতা ; সবাই যখন বঞ্চিত তখন সম্পদের মধ্যে ডুবিয়া থাকা পাপ। আমার দেশ যখন আর এক জাতি আসিয়া অধিকার করে, আমার জাতির হৃদয়রক্ত যখন আর এক দেশ আসিয়া শুষিয়া লয়, আমার ললাটে গোলামের কালিমা লেপিয়া দেয়, তখনো যদি আমি শান্তি কামনা করি তবে আমাকে ধিক্। তখন অশান্তিই আমার ধর্ম্ম, অসন্তোষই আমার কাম্য। আমাকে একদল মানুষ মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করিয়া রাখিবে, উন্মুক্ত অবারিত জীবনের মধ্যে বাঁচিতে দিবেনা, আইনের পাথরের মুঠির মধ্যে আমার সত্তাকে সঙ্কুচিত করিবে—এমনি অবস্থার মধ্যে বাঁচিয়া থাকায় আছে দুঃসহ গ্লানি। এই গ্লানি তাহারাই দিনের পর দিন

* বলাকা।

বহন করিয়া চলে যাহারা বিপদকে, দুঃখকে ভয় করে। পাঞ্জাবে কর্ত্তৃপক্ষ প্রত্যেক পুরুষকে একটী বিশেষ স্থানে বুকে হাঁটিতে বাধ্য করিয়াছিল। কেন তাহারা মানুষের দেহ লইয়া পশুর মত অপমান সহিয়া ছিল? ভয়ে—হুকুম অমান্য করিলে মাথা ফাটিবার যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল সেই ভয়ে। শির বাঁচাইতে গিয়া যাহারা পেটে হাঁটিতে সম্মত হয় তাহাদের গ্লানির অপেক্ষা বিপদ দুঃসহ। বিপদ সাংঘাতিক জানিয়াও যাহাদের কাছে বিপদ অপেক্ষা গ্লানি দুঃসহ তাহারা শির বাঁচাইবার জন্য পেটে হাঁটার অপেক্ষা আহত রক্তাক্ত শিরে পট্টি জড়াইয়া খাড়া থাকা শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে। তাহাদের ললাটে অলক্ষণের তিলকরেখা; তাহাদের হাতে বিদ্রোহীর নিশান। তাহারা বলে—'না খেয়ে মরার দুঃখ কম নয় কিন্তু এমন অবস্থা আসে যখন বেঁচে থাকার মত দুঃখ আর নাই।' ভীষণতা অন্যায়ের ছদ্মবেশ; ভয় ক'রে তাকে যেন সম্মান না করি। অন্যায়কারীকে ক্ষুদ্র ব'লেই জানতে হবে—অতি ক্ষুদ্র—তা'র হাতে যতো বড়ো একটা দণ্ড থাক্। তাকে যদি ভয় করি তবে তা'র চেয়েও ক্ষুদ্র হ'তে হবে। ইহাই বিদ্রোহীর কথা।

কিন্তু এই কথা যাহারা বলে তাহাদের পথ কখনো কুসুমে আকীর্ণ হইবেনা—রক্তে লাল হইবে। তাই স্বাধীনতার মন্দির দুয়ারে যে পথ আমাদিগকে লইয়া যায় তাহা কোন দিনই শুভ্র নহে—তাহা যুগে যুগে শহীদের হৃদয়-শোণিতে রক্তবর্ণ হইয়া আছে। সে পথ দুঃখের পথ, অশান্তির পথ—তবু সেই পথই বীরের পথ—মহাজনের পথ। এই পাষাণ-কঠিন পথের যাহারা পথিক তাদেরই রক্তপান করিয়া বড় বড় ভাব এবং বড় বড় কল্পনা পরিপুষ্ট হইয়াছে—তাহাদেরই বিদ্রোহের পরশ মণি পুরাতন, জীর্ণ, অলোহীন আশাহীন বিশ্বকে বারে বারে নূতন করিয়া রচনা করিয়াছে। Oscar Wilde এর ভাষায়: "It is through disobedience that progress has been made, through disobedience and through

rebellion.” সক্রেটিস্, জোয়ান অফ-আর্ক, যীশুখৃষ্ট, গান্ধী, লেনিন, ক্রোপটকিন্—কে বিদ্রোহী নয়? সকলের ললাটেই দুঃখের রাজ-টীকা। সক্রেটীস্ বিষপান করিয়াছে, জোয়ান-অফ-আর্ক অগ্নি শিখায় পুড়িয়া মরিয়াছে, যীশুখৃষ্ট ক্রুশকাষ্ঠে নিহত হইয়াছে, গান্ধী কারাগারে জীবন কাটাইয়াছে, পরে গুলির আঘাতে নিহত হইয়াছে; নির্ব্বাসিত লেনিন ও ক্রোপটকিন বিদ্রোহীর কণ্টক মুকুট পরিয়া ইউরোপের দেশে দেশে ঘুরিয়াছে। যাহারা দশের সঙ্গে গোঁজামিল দিয়া চলিয়াছে তাহারা জগতকে নূতন কিছু দান করে নাই। যাহারা বিদ্রোহী, যাহারা নিজের কর্ত্তৃত্ব ছাড়া অন্যের কর্ত্তৃত্বকে স্বীকার করে নাই মানুষের ইতিহাসকে যুগে যুগে তাহারাই গড়িয়াছে।

একদিন ছিল, কবি যেদিন বাস করিতেন পদ্মার তীরে বাঙলার এক শান্ত ছায়াময় পল্লী গৃহে। সেদিন ‘সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিমাঝে’ আপনার মর্ম্মবাণী শুনিয়া তাঁহার দিন কাটিত। সেদিন তিনি বিহার করিতেন গল্পজগতে, ডুবিয়া রহিতেন নিজেরই স্বপ্নের মধ্যে। বৃহৎ জগতের ক্রন্দন আসিয়া কবির চিত্তকে সেদিন কদাচিত বিচলিত করিত। ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মত কবি সেদিন সংসার হইতে পলাইয়া আসিয়া পদ্মার নিভৃত তীরে আপন মনে বাঁশি বাজাইয়া দিন কাটাইতেন। সে ছিল ভাবুকের সৌন্দর্য্যের জগৎ;—তাহার সহিত সংসারের প্রতিদিনের সুখদুঃখের নিবিড় পরিচয় ছিলনা; নিপীড়িত, নিষ্পেষিত বিপুল মানব পরিবারের শব্দহীন বিরাট ক্রন্দন কবির সেই স্বপ্নের জগতে দুঃখের ছায়া ফেলিত না। সেখানে কবি চাহিয়া চাহিয়া দেখিত নীল নদীরেখা, বালুকার কোলে নিভৃত জলের ধারে চখাচখির মেলা, ভেসে-যাওয়া মেঘ হইতে নদীস্রোতে ছায়ার নিঃশব্দ সঞ্চরণ। মাঠে মাঠে নূতন কচি-ধানে বাতাসে ঢেউ তুলিত, কুটিরের বেড়ার উপরে ঝুম্‌কা লতা দুলিত, নীল আকাশের হৃদয়খানি সবুজ বনে মিশিত। এই সব দৃশ্য কবিকে তন্ময় করিয়া রাখিত। রাত্রে বিরাট আকাশ ভরিয়া

তারা উঠিত, নদীর মৃদু কল্লোলধ্বনি গান শুনাইত, শূন্য প্রান্তরের সঙ্গীত মনকে উদাস করিয়া দিত, কাব্যময় জগতে কবির তখন অজ্ঞাতবাস। সেখানে নদী, বন, আকাশ ও মাঠের সহিত সৌন্দর্য্যমুগ্ধ মানবচিত্তের দিবানিশি প্রেমালাপ চলিত। সেখানে সবই ছিল—ছিল না শুধু মানুষের দুঃখ-সমুদ্রের কোলাহল—ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের সেই—the still sad music of humanity.

সহসা কবির নিভৃত কল্পকুঞ্জে দূর হইতে ভাসিয়া আসিল ক্রন্দনের কলরোল। ভাবের ক্রোড়ে নিলীন কবি আপনার স্বপ্ন লইয়া বিভোর ছিলেন—নিখিলের হাহাকার আসিয়া সেই স্বপ্নের জগৎ ভাঙ্গিয়া দিল; সৃষ্টিছাড়া কবির সম্মুখে নূতন জগতের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। সেই জগৎ উৎপীড়িত মানবের ব্যথার জগৎ—যে মানুষের ম্লান মুখে শত শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী লেখা রহিয়াছে—প্রবলের উদ্ধত অন্যায় লক্ষ মুখ দিয়া যাহার বক্ষঃ-রক্ত শোষণ করিতেছে—যাহার মূঢ়ম্লান মূক মুখে ভাষা নাই, শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে আশা নাই—যে মানুষ বঞ্চিত, উপেক্ষিত, সর্ব্বহারা। এই দুঃখের জগৎ সম্বন্ধে কবি এতদিন উদাসীন ছিলেন। কিন্তু এই ঔদাসীন্য আত্মোপলব্ধির পথে অন্তরায়। যেখানে ফুল ফোটে, পাখী ডাকে, বাঁশি বাজে, হাসি উঠে সংসারের সেই আলোর এবং আনন্দের দিকটাই মানিয়া লইব—আর যেখানে লোভীর নিষ্ঠুর লোভ, ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, ব্যথিতের অশ্রুজল, হিংসার হলাহল, মৃত্যুর লুকোচুরি, অশান্তির ঘূর্ণি, যেখানে দুঃখ, পাপ এবং অমঙ্গল সেখানেই শিকারীর দ্বারা আক্রান্ত উষ্ট্রপক্ষীর মত চোখ বুঁজিয়া রহিব? সৃষ্টির মধ্যে অন্ধকার দিকটার যদি কোন সার্থকতা থাকে তাহাকে উপেক্ষা করিলে ভালোমন্দ, সুখদুঃখের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইব না—সবটাই বেসুরো মনে হইবে। আর যদি অন্ধকার দিকটা আমাদের শত্রু হয় এবং তাহাকে পরাজিত ও উন্মূলিত করিবার প্রয়োজন থাকে তাহা হইলেও সেদিকে চোখ বুঁজিয়া থাকা একেবারেই সমীচীন নহে; কারণ

সংসারে ও জীবনে তাহার যে একটা অস্তিত্ব আছে এ কথা অস্বীকার করিয়া লাভ কি? তাই কবি যেদিন নিজের রচিত সৃষ্টি-ছাড়া জগৎ হইতে মানবের বিরাট বেদনার জগতের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন সে দিন তাঁহার জীবন নূতন করিয়া আরম্ভ হইল। কবির জীবনের এই মহাপরিবর্ত্তনের (conversion) কাহিনী প্রকাশ পাইয়াছে—'এবার ফিরাও মোরে' শীর্ষক অপরূপ কবিতায়।

'বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায়' বসিয়া যে অনেকদিন কাটিয়া গেলো! সংসার হইতে সুদূরে নিজের কল্পনা লইয়া এমন করিয়া ত' আর বিলাসিতা করা চলে না!

বড় দুঃখ, বড় ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার!
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট! এ দৈন্য মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি। *

কবি যদি কল্পনার সমীরে সমীরে দুলিয়া বেড়ায় তবে এই দৈন্যের মাঝে কে বিশ্বাসের ছবি আনিবে? কবি যদি সৌন্দর্য্যের মোহিনী মায়ায় ডুবিয়া মানবের মঙ্গলকে বিস্মৃত হয় তবে মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীতে 'গীতশূন্য অবসাদপুর' কে উল্লাসে ভরিয়া তুলিবে? দুঃখ, পাপ, অত্যাচার, অনাচার এবং অমঙ্গলের অভ্রভেদী বিরাট রূপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অকম্পিত বুকে কে বলিবে?—

তোরে নাহি করি ভয়,
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব দেখ!
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক! †

* চিত্রা।
† বলাকা।

কিন্তু সংসারে অন্যায়, অত্যাচার, পাপ, অমঙ্গল তো চিরকাল ধরিয়াই আছে। তাহারা অভ্রভেদী পাহাড়ের মতো। তুমি সেই পাহাড়ে মাথা ঠুকিয়া কি করিবে? অন্যায়কে বাধা দিতে গিয়া কতো শহীদ না এ পর্য্যন্ত প্রাণ দিয়াছে—কিন্তু অন্যায় তো উৎপাটিত হয় নাই। কবি এই সমস্যার উত্তর দিয়াছেন 'তপতী' নাটকের 'কুমারে'র মুখে যেখানে সে বলিতেছে, "কিছু না পারি তো ম'রবো। পাপকে ঠেকাবার জন্য কিছু না করাই তো পাপ।" কিন্তু তুমি তো অত্যাচার করিতেছ না—যে অত্যাচারী সে আপনার কুকর্ম্মের ফল ভোগ করিবে। আর উৎপীড়িত মানবের কথা বলিতেছ? তাহারা ভীরু, কাপুরুষ; পূর্ব্ব জন্মে তাহারা পাপ করিয়াছে; এ জন্মে তাহারই ফল ভোগ করিতেছে। তুমি কেন ইহার মধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে যাও? কেন নিজের শান্তিকে অনর্থক আঘাত করিবে? কেন মৃত্যু ও দুর্দ্দিনকে ডাকিয়া আনিবে? কিন্তু কবির মনে এ যুক্তিও স্থান পাইল না। তিনি বলিলেন—চারি দিকে সহস্র সহস্র মানুষ যদি না খাইয়া মরিল, অত্যাচারে মৃতপ্রায় হইয়া রহিল তবে কি হইবে আমার কাব্যের সাধনায় অথবা মুক্তির সাধনায়? এ তো মুক্তি-সাধনা নয়; এ যে হৃদয়হীনতা, স্বার্থপরতা।

বিশ্ব যদি চ'লে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
একা আমি ব'সে রব মুক্তি-সমাধিতে?

নিজেকে যদি বিশ্বের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিতে না পারিলাম, বিশ্বের সুখ দুঃখকে যদি নিজের মধ্যে অনুভব না করিলাম তবে তো নিজের রচিত খাঁচার মধ্যে মরিয়া রহিলাম! এই উপলব্ধি যখন হইল—তখন কবি অপূর্ব্ব ভাষায় আপনার অনুভূতিকে রূপ দিলেন।

কী গাহিবে' কী শুনাবে, বল, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ।
বৃহৎ জগৎ হ'তে সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে,
মহা-বিশ্ব-জীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে

নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুরে করি না শঙ্কা। দুর্দ্দিনের অশ্রু জলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি, তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে, জীবন সর্ব্বস্ব ধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি—*

সেই যে অ-জানা জন—হৃদয়ের মধ্যে সত্যরূপে যিনি লুকাইয়া আছেন—তিনি যখন তাঁহার দুর্জ্জয় আহ্বান পাঠাইয়া দেন তখন প্রিয়ার অরুণ তরুণ অধর, মাতার স্নেহময় কোল, প্রিয়জনের আলিঙ্গন, জীবনের সর্ব্বপ্রিয় বস্তু কোথায় পড়িয়া থাকে! মানুষ তখন পাগল হইয়া ছুটে আদর্শের পানে!

শুধু জানি— যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জ্জন,
নির্য্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি'। মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তা'রে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,
সর্ব্বপ্রিয় বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তা'রি লাগি জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন।
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম অর্ঘ্য উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি' প্রাণ। †

বুকের মধ্যে তিনি হইতেছেন নীরব বজ্রবাণী—"the still small voice within." তিনি নিষ্ঠুর। যাহার গলায় তিনি বরণমালা পরাইয়া দেন মরণ তাহার সাথী হয়; আরাম তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে। তাহার মধ্যে জাগিয়া উঠে সেই বেদনা যাহা তাহাকে বসিয়া থাকিতে দেয় না—কেবল দূর হইতে সুদূরে লইয়া

* চিত্রা।

† চিত্রা।

যায়। Browning-এর ভাষায় "Each sting that bids nor sit nor stand but go."

তুমি ব'সে থাকতে দেবে না যে,
দিবা নিশি তাইত বাজে
পরাণ-মাঝে এমন কঠিন সুর। *

এই নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়, দুঃখের ভীষণ দেবতাকে কবিতার অর্ঘ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ যেখানে পূজা করিয়াছেন সেখানে জাতির জীবনে তিনি যুগান্তর লইয়া আসিয়াছেন। আমরা দেবতার হস্তে বাঁশি, শিরে শিখিপুচ্ছ এবং গলায় বনফুলের মালা দেখিতে অত্যন্ত অভ্যস্ত হইয়াছিলাম। যেখানে নরমুণ্ডের মালা পরিয়া রক্তাক্ত চরণে উলঙ্গিনী মহাকালী নৃত্য করিতেছেন সেখানে আমরা ভয়ে চোখ নিমীলিত করিয়া রহিতাম। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। "ছাড়ি হিম শশাঙ্ক সুন্দর কে বা বল চায় মধ্যাহ্ন তপন-জ্বালা?" "The weakness of the human heart wants only fair and comforting truths or in their absence pleasant fables; it will not have the truth in its entirety because there is much that is not clear and pleasant and comfortable, but hard to understand and harder to bear."†

কিন্তু এমনি করিয়া ফলে ফুলে আরামের মধ্যে দেবতার শুধু সুখের উপাসনা করা—ইহা কেবল আপনাকে ভুলানো। যেখানে দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ঝঞ্ঝা, অগ্নি, বিপ্লব এবং ক্রুদ্ধ সাগরের উন্মাদ গর্জ্জন—সেখানেও তো ভগবান। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, পাপ-পুণ্য সব লইয়াই জীবন এবং জগৎ। যা কিছু কঠিন এবং অমঙ্গল তাহার জন্য দায়ী করিব শয়তানকে, অন্ধপ্রকৃতিকে অথবা মানুষের কর্ম্মফলকে, আর মঙ্গলের দিকটার সমস্ত গৌরব দিব ভগবানকে—এইরূপ যুক্তি স্বীকার করিয়া লইলে ভগবানের উপর মানুষের ক্ষমতা মানিয়া লওয়া

* গীতালি।
† Aurobindo—"Essays on the Gita."

এবং দেবতা ও প্রকৃতির মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করা হয়। ভারতবর্ষের চিন্তাবীরগণ এইরূপ ভাবে জগৎ ও জীবনকে দেখেন নাই। তাঁহারা কঠোর সত্যের দিকে পিছন ফিরিয়া দেবতার কেবল কোমল-রূপের পূজা করেন নাই; জীবন ও মৃত্যু উভয়েরই মধ্যে দেখিয়াছেন এক ভগবানের প্রকাশ। ভারতবর্ষ বলিয়াছে, ভগবান কেবল ননীর মত কোমল, শিরীষ ফুলের মত সুকুমার এবং প্রজাপতির মত সুন্দর নহেন—তিনি ঝড়ের মেঘের মতো কালো, কূলশূন্য সমুদ্রের মত কালো—তারই তুফানের উপর সন্ধ্যার রক্তিমার মতো ভয়ঙ্কর। তাঁহার ধ্বজায় 'পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা'।

পুষ্পবনে,
পুণ্য সমীরণে,
তৃণপুঞ্জে পতঙ্গ-গুঞ্জনে,
বসন্তের বিহঙ্গ-কূজনে,
তরঙ্গচুম্বিত তীরে মর্ম্মরিত পল্লববীজনে
যাঁহার প্রকাশ,
গর্জ্জমান বজ্রাগ্নি শিখায়
সূর্য্যাস্তের প্রলয় লিখায়,
রক্তের বর্ষণে,
অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে
তাঁহারই প্রকাশ।

বিশ্বেশ্বরের ভয়ঙ্কর দিকটাকে কবি প্রথমে কামনা করেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার প্রিয়তমের গলায় যে মালাখানি দুলিতেছিল তাহাই তিনি চাহিয়া লইবেন। কিন্তু মালার পরিবর্ত্তে যাহা তিনি পাইলেন তাহা তরবারি।

এ ত মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি।
জ্বলে ওঠে আগুন যেন,
বজ্র হেন ভারি—
এ যে তোমার তরবারি। *

* বলাকা।

কবি শুধু সুন্দরকে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু তিনি দেখা দিলেন প্রচণ্ড-মনোহর বেশে ; রাখিয়া গেলেন বুকের মাঝে বেদনা। 'সর্ব্বনেশে' আসিয়া কবির কণ্ঠে বরণ-মালা পরাইয়া দিল—সেই 'সর্ব্বনেশে' যাহাকে ভালোবাসিলে পথে ভাসিতে হয়। বৃন্দাবনের বাঁশি শুনিবার জন্য যিনি উৎকর্ণ হইয়া ছিলেন কুরুক্ষেত্রের পাঞ্চজন্য তাঁহাকে ডাক দিল ; ফুলের পাঁপড়ি-বিছানো পথে যিনি চলিতে চাহিয়াছিলেন অজানা দেবতা তাঁহাকে পাষাণ-কঠিন পথে চলিবার নিমন্ত্রণ পাঠাইল। রুদ্রের এই আবির্ভাবে বিস্মিত ও বিমোহিত কবি গাহিলেন—

ভৈরব, তুমি কী বেশে এসেছো,
ললাটে ফুঁসিছে নাগিনী,
রুদ্রবীণায় এই কি বাজিল
সুপ্রভাতের রাগিণী ?
মুগ্ধ কোকিল কই ডাকে ডালে ?
কই ফোটে ফুল বনের আড়ালে ?
বহুকাল পরে হঠাৎ যেন রে
অমানিশা গেল কাটিয়া।
তোমার খড়্গ আঁধার-মহিষে
দুখানা করিল কাটিয়া। *

ফুল কোথায় ? কোকিলের কূজন কোথায় ? সুপ্রভাতের রাগিণী কোথায় ? দেবতার প্রসন্ন মুখ কোথায় ? ভগবান একী বেশে আসিয়া কবির সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন ? এ যে দেবতার রুদ্রের বেশ—যোদ্ধার বেশ—যে বেশে তিনি মৃত্যু বিলাইতেছেন—ধ্বংসের মধ্য দিয়া বিশ্বকে নিমেষে নিমেষে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতেছেন। কবির চোখে এতদিন ভালো লাগিয়াছিল দেবতার বাহুর ভূষণ ; এবার তাঁহাকে মুগ্ধ করিল দেবতার হাতের তরবারি।

* প্রবাহিনী।

সুন্দর তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত
খড়্গ তোমার হে দেব বজ্রপাণি, চরম শোভায় রচিত। *

দেবতার অঙ্গদখানি সুন্দর—কিন্তু আরও সুন্দর দেবতার খড়্গ। সেই ভীষণ দেবতার সম্মুখে কবি এবার যাহা প্রার্থনা করিলেন তাহা সুখ নয়, শান্তি নয়, আরাম নয়—তাহা বেদনা, তাহা অশান্তি।

তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা। †

আর সুখ নয়, আরাম নয়, অন্যায়ের সঙ্গে সন্ধি নয়—এবার কবি বলিলেন, 'অস্ত্রে দীক্ষা দেহ রণগুরু'। হে রণগুরু, এবার অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে শিখাও—যেমন করিয়া তুমি সংগ্রাম করিতেছ অন্ধকারের বিরুদ্ধে অনন্ত জ্যোতিঃরূপে—শূন্যতার বিরুদ্ধে অসীম প্রাণরূপে। কেহ যদি বলে—রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে কি দিয়াছেন? আমি বলিব—তিনি আমাদের চিন্তার জগতে ঝড় আনিয়া দিয়াছেন। দেবতার কাছে কবি মালা চাহিয়াছিলেন—সেই মালার পরিবর্ত্তে কবি যে তরবারি পাইলেন সেই তরবারি আমাদিগকে তিনি দান করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে বীর্য্যের মন্ত্র দিয়াছেন, কুঞ্জে কুঞ্জে মৃত্যুর বিপ্লব আনিয়া শীর্ণ পর্ণরাশি ধূলায় বিকীর্ণ করিয়াছেন, জাতীর অবসাদগ্রস্ত বক্ষতলে নিঃশঙ্ক দুর্জ্জয় শঙ্খ বাজাইয়াছেন,—অতীতের আবর্জ্জনাভার রুদ্রহস্তে সরাইয়া দিয়াছেন, বার্দ্ধক্যের স্তূপাকার আয়োজন ব্যর্থ করিয়া যৌবনের গলায় তিনি বরণমালা পরাইয়াছেন।

কিসেরি বা সুখ, ক'দিনের প্রাণ!
ঐ উঠিয়াছে সংগ্রাম গান,
অমর মরণ রক্ত চরণ
নাচিছে সগৌরবে। ‡

* গীতিমাল্য। † বলাকা। ‡ স্বদেশ ও সংকল্প।

কবি জাতিকে মরিতে শিখাইয়াছেন—অমর মরণের প্রচণ্ড-সুন্দর রূপ আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন—বিপদের বুকে ঝাঁপ দিবার প্রেরণা দিয়াছেন—কূল হইতে অকূলের পানে আমাদিগকে তিনি টানিয়াছেন। এ যে কত বড় দান, জাতির চিন্তা জগতে এই বিপ্লব সৃষ্টির মূল্য যে কতখানি, তাহার পরিমাণ করা যায় না। কাছের পাওনা লইয়া আমরা ব্যস্ত ছিলাম—সুদূরের বেদনা আমাদের মনে জাগে নাই। সেই বেদনা জাগাইয়াছেন কবি। পরাধীন জাতির জীবনে এই বেদনার মূল্য কে নিরূপণ করিবে? ঐশ্বর্য্যবান কবির মধ্যে জাতি আপন ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পাইয়াছে—বিপুল আলোকের স্বপ্নে চঞ্চল কবির চোখে জাতি মহান বিশ্ব-মানবের স্বপ্ন দেখিয়াছে—কবির জীবনে জীবন লাভ করিয়া সুপ্তি-মগ্ন জাতি মুক্তির মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে।

পরিশিষ্ট

বিপ্লবী রবীন্দ্রনাথ

To find a new vision of the world, a new path to truth is the instinct of the artist or the thinker. He changes the whole system of our organised perceptions."

"শিল্পীর অথবা ভাবুকের মনের সহজ গতি হচ্ছে একটা নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখা, সত্যে উপনীত হবার একটা নূতন পথ আবিষ্কার করা। আমাদের সমস্ত চিন্তার ধারাকে তিনি একটা নূতন পথে চালিয়ে দেন।"

প্রথিতযশা পণ্ডিত হ্যাভেলক এলিস শিল্পী অথবা ভাবুকের এই যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন—এর মধ্যে কোন ভুল নেই। এঁদের কথা ছেঁদো কথা নয়,—নতুন কথা যার মধ্যে লক্‌লক্ করে আগুনের শিখা। এঁরা দশের প্রতিধ্বনি ন'ন—এঁরা বহু জনের মধ্যে একা। আর মানুষের ইতিহাসে বারে বারে যুগান্তর এনেছে তাঁদেরই অগ্নিগর্ভ বাণী যাঁরা সমসাময়িক কালের কাছ থেকে পেয়ে গেছেন শুধু আঘাতের পর আঘাত—যাঁদের গান তখনকার দিনের লোকের কানে বেতালা ব'লেই মনে হয়েছে—যাঁহাদিগকে জনসাধারণ অদ্ভুত মনে করেছে। অদ্ভুত যে মনে করেছে—তার যথেষ্ট কারণ আছে। আমরা যে-সব আদর্শকে অন্তরের বেদীতে বসিয়ে পুরুষানুক্রমে পূজা ক'রে এসেছি—প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক অথবা ভাবুকেরা এসে সেই আদর্শগুলিকে অবজ্ঞা করেছেন; আমাদের কাছে যা পর্ব্বত ব'লে মনে হ'য়েছে তাঁরা এসে তাকে উইয়ের ঢিবির পর্য্যায়ে ফেলেছেন; আমরা যাকে উইয়ের ঢিবির মত অবজ্ঞা ক'রে এসেছি তাঁরা এসে তাকে পর্ব্বত ব'লে অভিনন্দন জানিয়েছেন। 'পুঁথির কথা কইনি মোরা উল্টো কথাই কই'—যুগে যুগে 'জীনিয়াস্'দের

কণ্ঠ থেকে এই বাণীই উৎসারিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ রকম অবস্থায় যা ঘটা স্বভাবিক যুগে যুগে 'জীনিয়াস'দের ভাগ্যে তাই ঘটেছে, অর্থাৎ লোকের আত্মাভিমানে তাঁদের উল্টো কথা যথেষ্ট আঘাত দিয়েছে এবং ফলে তাঁহাদিগকে ভোগ করতে হ'য়েছে যথেষ্ট বিড়ম্বনা। প্রত্যেক যুগেই মানুষ তখনকার দিনের প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে অথবা রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক এবং অনিবার্য্য ব'লে স্বীকার ক'রে নেয়। তাদের আদৌ কোন মূল্য আছে কি না—এ প্রশ্ন তার মনে কখনো উঠেই না। চিনেমাটির প্লেটে গরম দুধ রাখা হয়েছে। বেড়ালের বাচ্চা সেই দুধ জিব দিয়ে চক্ চক্ করে খায়। চিনেমাটির কথা সে কিছু জানে না। গোরু গোয়ালে খইল আর বিচুলি গলাধঃকরণ করে। কোথা থেকে খইল আর বিচুলি এল'—এ প্রশ্ন তার মাথায় কখনো আসে না। আমরা মনুষ্যনামধারী জীবেরাও যা পাই সরল বিশ্বাসে তাকে গ্রহণ করি—তার ভালমন্দ বিচার ক'রে খতিয়ে দেখতে যাই নে। আমাদের সকাল বেলার চা-রুটি, আমাদের রেলগাড়ী, টেলিফোন, সিনেমা, নীতির অনুশাসন, আদর্শের মাপকাঠি—এগুলোকে নিয়ে মাথা ঘামানো আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। যে সমাজিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে আমরা বেড়ে উঠি তারই রঙে আমাদের চিত্ত আপনা থেকেই রাঙিয়ে যায়। ইতিমধ্যে কেউ যদি এসে আমাদের ধারণাগুলিকে পাল্‌টিয়ে ফেলতে বলে—আমরা তার দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকাই এবং মনে মনে তার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে উঠি। আমাদের আদর্শগুলি আমাদের কাছে পুত্রকন্যার সামিল হ'য়ে ওঠে ব'লেই তাদের সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন তুললে আমরা ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলি। আমাদের কানা ছেলেকে কেউ কানা ব'ললে অথবা খোঁড়া মেয়েকে কেউ খোঁড়া ব'ললে যেমন সেই সমালোচনা আমাদের কাছে অপ্রীতিকর লাগে—আমাদের মনের কোণের সযত্নে লালিত ধারণাগুলির কেউ বিরুদ্ধ সমালোচনা ক'রলেও আমরা তেমনই আঘাত পাই। আমরা

প্রশ্নকারীকে সমাজের শত্রু ব'লে মনে করি ; তাকে ক্রুশ কাঠে ঝোলাই, অগ্নিশিখায় পোড়াই, পাথর ছুঁড়ে মারি, ফাঁসিকাঠে তুলি— যত রকমে পারি তাকে আঘাত দিতে ত্রুটি করি নে।

মনের এই যে জড়তা, যে জড়তার জন্য আমরা হৃদয়ের কোণে যে-সব ভ্রান্ত আদর্শকে সাদরে স্থান দিয়ে এসেছি, তাদের ত্যাগ করতে পারি নে এবং যে-সব নূতন আদর্শকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করা উচিত তাদের গ্রহণও করতে পারিনে, এই জড়তা ঘুচিয়ে মানুষকে নতুন ক'রে ভাবতে শেখান'ই হচ্ছে 'জীনিয়াস'দের কাজ।

রবীন্দ্রনাথ জাতিকে নতুন ক'রে ভাবতে শিখিয়েছেন। যে জড়তা আমাদের মনকে পঙ্গু ক'রে রেখেছিল তার আধিপত্যকে তিনি শিথিল করেছেন। তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন একটা নূতন স্বদেশের আদর্শ সেই আদর্শ জ্যোতির্ম্ময় হয়ে তাঁর একটি কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে—

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্ব্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি',
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হ'তে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্ম্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি',
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দ্দয় আঘাত করি, পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।

এখানে স্বদেশের যে নতুন স্বপ্ন কবি আমাদের মনের মধ্যে জাগিয়েছেন সেখানকার মানুষগুলির প্রথম বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তাদের চিত্তের নির্ভীকতা। তারা মাথা কারও কাছে নত ক'রবে না। অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কবি সহজেই দেখতে পেয়েছেন, স্বদেশকে নতুন করে গ'ড়তে হ'লে স্বদেশের নবযৌবনকে নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত কর'তে হবে আর এই নতুন আদর্শ হ'ল নির্ভীকতার আদর্শ। নীট্‌শের Thus Spake Zarathustraতে আছে, 'What is good? Ye ask: It is good to be brave." তোমরা সুধাও, কি ভালো? ভালো, সাহসী হওয়া।" রবীন্দ্রনাথও স্বদেশের কর্ণে বজ্র-গর্জ্জনে ঘোষণা করিলেন 'It is good to be brave.' শীর্ণ শান্ত সাধু'দের 'নিরাপদ নম্রতা'র আদর্শকে তিনি কোন মূল্য দিলেন না। তিনি মূল্য দিলেন পৌরুষের আদর্শকে; কারণ পৌরুষের অভাবই আমাদের চিত্তকে জড়তায় পঙ্গু করে রেখেছে। সত্যকে যে গ্রহণ কর'তে পারছি নে কারণ তা অপ্রিয়। যা অপ্রিয়, আমাদের স্বার্থের বিরোধী যা আমাদের অনেক দিনের সংস্কারকে আঘাত দেয়—তা সত্য হ'লেও তাকে অসত্য ব'লে মনে করাই মানব-স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই যে দুর্ব্বলতা—একে যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা কাটিয়ে উঠ্‌তে না পারছি ততক্ষণ যা সত্য, যা শিব, যা সুন্দর তাকে আমরা জয়যুক্ত ক'রতে পারব না। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে চাই বলিষ্ঠ চিত্তের সেই নির্ভীকতা যার বর্ম্মে আবৃত হয়ে যে নূতন অত্যন্ত অপ্রিয় তাকেও আমরা বরণ করতে পারি, যা অসত্য ব'লে মনে হ'য়েছে তা অত্যন্ত প্রিয় হ'লেও তাকে বর্জ্জন করবার মত অন্তরে সাহস খুঁজে পাই, যা সত্য বলে বিশ্বাস করি তার জন্য সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে কুণ্ঠিত হই না। এই নির্ভীকতা যতক্ষণ জীবনে না আসছে ততক্ষণ যে শৃঙ্খল মানুষের আত্মাকে অশেষ দুর্গতির মধ্যে বেঁধে রেখেছে তাকেই সে বারম্বার সোহাগ ক'রবে। বিধিব্যবস্থার মুখোস প'রে একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা তার আত্মপ্রকাশের পথে অন্তরায়

হ'য়ে থাকবে। অন্তরের এই যে নির্ভীকতা—এই নির্ভীকতাই তো যৌবনের বৈশিষ্ট্য। যৌবন সুখ চায় না, শান্তি চায় না, চায় জীবন। সেই জন্য অতীতের আরামদায়ক কোটরের মধ্যে নিরাপদে থাকার প্রতি কোন লোভ নেই তার। যা সত্য তারই মধ্যে সে বাঁচতে চায়, আর সেখানে বাঁচতে গিয়ে যদি চিরদিনের সংস্কারকে ত্যাগ করার দুঃসহ বেদণাকে বরণ ক'রতে হয়, না করে উপায় কি? যেহেতু এত দিন ধ'রে যা ভেবে এসেছি তার সঙ্গে যা নতুন তার কোন মিল নেই—এই জন্যই কি আমরা পুরানোকে আঁকড়ে প'ড়ে থাকবো? অজানাকে দূরে দূরে রেখে দেবো? যৌবন তো এমন করে কূলকে আঁকড়ে পড়ে থাকে নি। যে সমুদ্রে কেউ কোন দিন পাড়ি দেয় নি—কলম্বাস হ'য়ে সেই পথহীন সাগরবক্ষে সে দিয়েছে পাড়ি—যে অরণ্যে কেউ কোনোদিন পা দেয় নি লিভিংস্টোন হ'য়ে সেই অরণ্যে সে ক'রেছে পর্য্যটন। সত্যের জন্য মরিয়া হবার এই ক্ষমতা যে হারিয়ে ফেলেছে রবীন্দ্রনাথের বাণী তার জন্য নয়। রবীন্দ্রনাথ কবি—কিন্তু বিশেষ ক'রে যৌবনের কবি। তাঁর কবিতায় পথের জয়গান। তিনি তাদের জন্য, যাদের প্রাণকে কেউ বাঁধতে পারে নি, যারা মুক্ত-পথের পথিক, যাদের চিত্ত জড়িয়ে যায় নি কোনো বিশেষ মতবাদের বিধি-নিষেধের জঞ্জালের মধ্যে।

"ওগো আমি যাত্রী তাই—
চিরদিন সম্মুখের পানে চাই।
কেন মিছে
আমারে ডাকিস্ পিছে?
আমি তো মৃত্যুর গুপ্তপ্রেমে
রবো না ঘরের কোণে থেমে।
আমি চিরযৌবনের পরাইব মালা
হাতে মোর তারি তো বরণডালা।"

রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান যে সম্পদ দান ক'রেছেন সে হচ্ছে সব কিছুকে বিচার করবার একটা নূতন মাপকাঠি।

তিনি আমাদের অন্তরে জাগিয়েছেন সেই দুঃসাহস যার জোরে যেখানে কোনো নাবিক যেতে সাহস করে না সেখানেও যাবার সাহস জেগেছে আমাদের বুকে, পথে চলবার চাঞ্চল্য জেগেছে আমাদের পায়ে। এই যে অজানার পানে চলবার সাহস, এই যে spirit of adventure—এখানেই তো প্রগতির মূল কথা। এই অনুসন্ধিৎসা যেখানে জেগেছে সেখানে নবজীবনের স্পন্দনও শুরু হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যে নূতন আদর্শ নব্য ভারতের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর সাহিত্যকে সহায় ক'রে, সে হচ্ছে বন্ধনমোচনের দ্বারা আত্মপ্রকাশের আদর্শ। মানুষের জীবনের মূল্য আর সব কিছুর মূল্যকে ছাড়িয়ে আছে। রাষ্ট্রই হোক আর শাস্ত্রই হোক, সমাজই হোক আর ধর্ম্মই হোক—সব কিছুরই সার্থকতা হচ্ছে মানুষকে জ্ঞানের মধ্যে, সংস্কৃতির মধ্যে, স্বাস্থ্যের মধ্যে, জীবনের প্রাচুর্য্যের মধ্যে, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ মহিমার মধ্যে বিকশিত করিয়া তোলায়। মানুষ যেখানে দেহের স্বাস্থ্য এবং মনের স্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলে একটা কিম্ভূতকিমাকার জীবে পরিণত হয়েছে, সেখানে রাষ্ট্রেরও মূল্য নেই, সভ্যতারও মূল্য নেই, সমাজেরও মূল্য নেই, শাস্ত্রেরও মূল্য নেই। মানুষ তো একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কখনো উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হ'তে পারে না। সকলের উঁচুতে হোলো তার আসন। তাকে বিকশিত ক'রে তোলবার জন্যই সভ্যতার এই সহস্র উপকরণ, রাষ্ট্রের যত বিচিত্ররূপ, মতবাদের যত বৈচিত্র্য, সমাজের যত বিধিনিষেধ, শাস্ত্রের যত অনুশাসন। মানুষই যদি আত্মপ্রকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হ'য়ে রইল, তার দেহ যদি স্বাস্থ্যে সবল, মগজ যদি জ্ঞানে সতেজ এবং হৃদয় যদি প্রেমে বিশাল হবার সৌভাগ্য লাভ না ক'রলো—তবে কিসের জন্য রাষ্ট্রের এই ইমারৎ? কিসের জন্য সমাজের এই সব বিধি-ব্যবস্থা? কিসের জন্য সভ্যতার এই সব সাজ-সরঞ্জাম? কিসের জন্য কত যুগের, কত তপস্বীর নিদ্রাহীন দুর্জ্জয় তপশ্চর্য্যা? যুগে যুগে দেশে দেশে যত বড়ো বড়ো কবির

আবির্ভাব হ'য়েছে তাঁরা মানুষেরই জয়গান গেয়ে গেছেন তাঁদের কাব্যে। শৃঙ্খলমুক্ত পরিপূর্ণ মানবের জয়ধ্বনি বেজে উঠেছে তাঁদের কণ্ঠে। রবীন্দ্রসাহিত্যে এই মানুষেরই বন্দনাগান। A man before all—এই বাণীই হ'ল রবীন্দ্রনাথের বাণী। মানুষকে যা-কিছু খর্ব্ব ক'রতে চেয়েছে, তার আত্মপ্রকাশের পথে যা-কিছু বাধার সৃষ্টি ক'রেছে রবীন্দ্রনাথ তাকে ক্ষমা করেন নি কখনো। সমস্ত কিছু বাধাকে ছিন্ন ক'রে সবলে আপনাকে প্রকাশ করবার এই দৃপ্তবাণীই তো 'নৈবেদ্যে'র বহু কবিতায় ফুটে উঠেছে।

এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জাল,
এই পুঞ্জপুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল,
মৃত আবর্জ্জনা! ওরে জাগিতেই হবে
এ দীপ্ত প্রভাতকালে, এ জাগ্রত ভবে,
এই কর্ম্মধামে!

'অচলায়তনে'র প্রাকারকে যেখানে তিনি ধূলিসাৎ ক'রে দিয়েছেন সেখানে সমাজের নিরর্থক বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে তাঁর রসনায় সত্য বাক্য খর-খড়্গের মতোই ঝ'লসে উঠেছে। মানুষের আত্মাকে সঙ্কুচিত ক'রে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ বড়ো হ'য়ে উঠবে—মানবাত্মার এত বড়ো অপমান তিনি সহ্য ক'রতে পারেন নি। অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রান্তরে জেনারেল ডায়ার যখন নিরস্ত্র জনতার উপরে গুলি চালালো, ভয়ে ভীত নরনারীকে রাস্তার ধূলায় বুকে হাঁটালো, তখন সেই বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে প্রথম যাঁর কণ্ঠ তারস্বরে প্রতিবাদ জানালো তিনি রবীন্দ্রনাথ। নন্-কো-অপারেশন আন্দোলন আরম্ভ হবার পূর্ব্বেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপাধি ত্যাগ ক'রলেন। এখানেও রাষ্ট্রের দাবীর চেয়ে মানুষের দাবীকেই উচ্চতর আসন দেওয়া হ'য়েছে। মানুষের অপমান তাঁর চিত্তকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছে—অপমানিত মানুষের আহত চিত্তের বেদনাকে তিনি আপনার বেদনা ব'লে জ্ঞান ক'রেছেন। শক্তিমানের ঔদ্ধত্যকে বাধা দেবার জন্য প্রয়োজন আছে

এই রকম তেজস্বী মানুষের, যারা 'যোগাযোগে'র বিপ্রদাসের মতো ব'লবে, 'সর্ব্বনাশকে আমরা কোনো কালে ভয় করি নে, ভয় করি অসম্মানকে।' ম্যান্তামুখো নিরীহ-প্রকৃতির সাধু মানুষদের অভাব নেই। তাদের সংখ্যা প্রচুর। মিথ্যা কথা বলে না, চুরি করে না, মদ খায় না, পরস্ত্রীর মুখের দিকে তাকায় না, রবিবারে রবিবারে গীর্জ্জায় যায়, চূড়ামণি-যোগে শীতে কাঁপতে কাঁপতে গঙ্গায় ডুব দেয়, বাড়ীতে রেখে দু'চারটা গরীব ছাত্রও পড়ায়. কিন্তু ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে যে দৃপ্ত পৌরুষের প্রয়োজন' অন্যায়কে বাধা দিতে গেলে চরিত্রে যে নির্ভীকতা থাকা দরকার—সেই নির্ভীকতা এবং পৌরুষের অপ্রাচুর্য্যই তো জাতিকে পরাধীনতার অসম্মানের মধ্যে অভিশপ্ত ক'রে রেখেছে। "Order is good for what it implies and not for its own sake." (Laski.) আমরা যে রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার ক'রে নিই সে তো বিনা সর্ত্তে নয়। সেই আনুগত্যের অপরিহার্য্য সর্ত্ত হচ্চে—রাষ্ট্র আমাদিগকে জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সাহায্য ক'রবে। * রাষ্ট্র যদি সেই লক্ষ্যে পৌঁছাবার পথে সহায় না হ'য়ে অন্তরায় হয় তবে সে আমাদের আনুগত্যের উপরে কোনো দাবীই করতে পারে না—কারণ মানুষ রাষ্ট্রের চেয়ে বড়ো।

"মানুষের পরিবর্তে বিচার এবং আইন রুটির পরিবর্তে পাথরের মতো। সে পাথর দুর্লভ এবং মূল্যবান হইতে পারে কিন্তু তাহাতে ক্ষুধা দূর হয় না।"—রবীন্দ্রনাথ।

জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত আত্মপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ এই আত্মপ্রকাশের আদর্শকেই সর্ব্বোচ্চ আসন দান ক'রেছেন। এই আত্মপ্রকাশের পথে কিছু যদি অন্তরায় হয় তবে তার আনুগত্য

* "We give our allegiance to the State always upon the condition that its end satisfies that end we set before ourselves."

Laski.

স্বীকার না করার বাণীই রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে। 'মুক্তধারা'য় ধনঞ্জয় বৈরাগীর মুখ দিয়ে এই বাণীই তিনি প্রচার ক'রেছেন। পাপকে পাপ জেনেও যদি তার সঙ্গে মিতালি ক'রে চলি, অন্যায়কে অন্যায় জেনেও যদি তাকে যদি বাধা না দিই, তবে ভগবানের চোখে সেটা অপরাধ—এই কথাই কি রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাণে ঘোষণা করেন নি? শুধু চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা অথবা মদ খাওয়াই কি পাপ? 'পাপকে ঠেকাবার জন্য কিছু না করাই তো পাপ'—'তপতী' নাটকে এই আদর্শের প্রচারক রূপেই তো রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে আবির্ভূত হ'য়েছেন। এই একই আদর্শ প্রচার করবার জন্যই তো বঙ্কিমচন্দ্রকে 'কৃষ্ণ-চরিত্র' লিখতে হ'য়েছিল। আমেরিকার যুবকদের চিত্তে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার এই শৌর্য্যকে জাগ্রত করবার জন্য এমার্সনকে একদা ব'লতে হ'য়েছিল, Good-nature is plentiful, but we want justice, with heart of steel, to fight down the proud. ভারতবর্ষের যুবকদের চিত্তে ক্ষাত্রবীর্য্যের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে একই বাণী প্রচার ক'রতে হ'য়েছে। দু'জনই শক্তিমন্ত্রের উপাসক।

'রক্তকরবী'তেও কবি মানুষকে ধনতন্ত্রের নাগপাশ থেকে মুক্ত করবার জন্য লেখনী ধারণ ক'রেছেন। যক্ষরাজের পাতালপুরীতে মানুষের জীবনের মূল্যের চাইতে সোনার মূল্য অনেক বেশী। যক্ষরাজের মানুষ মানুষ নয়, কেবল সংখ্যা। তাই তো রাজার বিরুদ্ধে নন্দিনীর অভিযান। রাজাকে অবশেষে ধ্বজা ভেঙে ফেলে, শক্তির ঔদ্ধত্যকে বর্জ্জন ক'রে সুন্দরের চরণ-তলে আত্মনিবেদন ক'রতে হ'য়েছে। নন্দিনীকে সম্বোধন ক'রে তাকে ব'লতে হ'য়েছে,—

"এই আমার ধ্বজা, আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেলো ওর কেতন। আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক্, মারুক্, সম্পূর্ণ মারুক্ তাতেই আমার মুক্তি।"

রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রের শৃঙ্খল থেকে নাগরিকের জীবনমুক্ত করবার

জন্য যেমন লেখনী ধারণ ক'রেছেন, সমাজের অর্থহীন বিধি নিষেধের অচলায়তনকে যেমন ভেঙে ফেলেছেন মানুষকে তার অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য—তেমনি পুরুষের শাসনদুর্গকে ধূলিসাৎ করে নারীকে মুক্তি দেবার জন্যও তাঁর লেখনী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিয়েছে। গল্পগুচ্ছের মধ্যে 'স্ত্রীর পত্র' এই দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যে একটি অমূল্য সম্পদ। পাতিব্রত্য ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে নারীকে অশেষ লাঞ্ছনার মধ্যে বন্দিনী ক'রে রাখবার যে ইতিহাস আমাদের সমাজে চ'লে আসছে—সে ইতিহাস যে কত কলঙ্কের—সে কথাই রবীন্দ্রনাথ গল্পচ্ছলে আমাদের কাছে ব'লেছেন। নারী পতিব্রতা হ'তে গিয়ে আপনাকে পুরুষের ছায়া আর প্রতিধ্বনিতে পর্য্যবসিত ক'রবে, বস্তুর পর্য্যায়ে আপনাকে ফেলে রাখবে—এ আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ নিষ্ঠুর আঘাত দিয়েছেন, যেমন আঘাত দিয়েছেন ইবসেন্ তাঁর Doll's House এবং Ghosts এই দুইখানি নাটকে। 'স্ত্রীর পত্রে'র 'মেজবউ'কে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের আদর্শ সংসারের মধ্যে বেঁধে রাখতে পারলো না। পুরী থেকে মেজবউ স্বামীকে লিখছে, 'কিন্তু আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরবো না।' পুরুষ নারীর জীবনটাকে কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়ে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে—মানুষের এই অপমানের বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহের সুর 'যোগাযোগে'র মধ্যেও শুনতে পাই। মধুসূদন অপমানিতা বধূকে স্ত্রীর কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়ে বাড়ীতে ফিরিয়ে নেবার জন্য যখন ব'ললে 'মানে কী? বাড়ীর বৌ বাড়ীতে যাবে না?' তখন কুমু শুধু সংক্ষেপে বললে, 'না।' দৃপ্ত নারীর এই যে 'না' বলবার শক্তি—এই শক্তিরই উদ্বোধন ক'রতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ বাংলার শৃঙ্খলিত মাতৃজাতির হৃদয়ে। এ দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমরা অনায়াসে ব'লতে পারি, রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের ইবসেন্।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে জোরের সঙ্গে আমরা এই কথাই বলতে পারি যে তিনি আমাদিগকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ক'রেছেন। তিনি তাঁর ঋষির

দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন কোটি কোটি মানুষের ভীরুতাই প্রবলের ঔদ্ধত্যকে খাড়া রেখে পৃথিবীকে নরকের সামিল ক'রে তুলেছে।

দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্ব্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ। এক দিকে স্পর্দ্ধিত ক্রূরতা,
মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার, অন্য দিকে ভীরুতার
দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ···*

পৃথিবীকে আবার স্বর্গ ক'রে তুলতে হ'লে মানুষের হৃদয়ে সর্ব্বাগ্রে প্রতিষ্ঠিত করা চাই নির্ভীকতার আদর্শ। বর্ব্বরতার দিগ্‌বিজয়ী অভিযানকে ঠেকাতে হ'লে মানুষকে ডাক দিতে হবে শক্তির ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য। তাই রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রান্তে এসে বাংলার নবযৌবনের কর্ণে যে আহ্বান প্রেরণ ক'রেছেন সে হচ্ছে সংগ্রামের আহ্বান।

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস···

বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

(প্রান্তিক)

* প্রান্তিক।